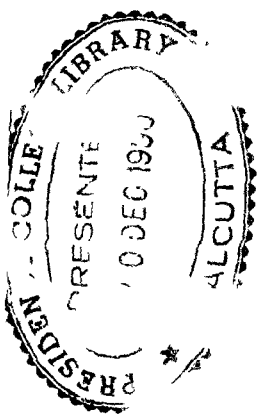

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY CALCUTTA
PRESENTED
10 DEC 1990

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা ১৯৮৭

৭৫ বছর

"বৃষ্টি পড়িতেছে আর সবুজতেজময় রোমশ পদ্মপত্র মাঝে বিন্দু বিন্দু জল সঞ্চার হইয়া মূর্ত্তিমত পারদ আলো বিচ্ছুরণ করি আঁশি ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ মেঘলা আকাশ ফুড়িয়া শ্রীমতী প্রসাধন মুখ ছায়াপাত করিতেই আঁশির রূপ যেন অগ্ন্যুৎপাতের ঘটা মহাপ্রলয়ের দেহ ধারণ পূর্বক নারীর আবরণ স্পর্শ করে আর সৃষ্টি হয় মনপ্রাণশ্বাসবায়ুস্পন্দহীন নান্দীমুখ যথা দর্শনাধার প্রচ্ছদপট"—এ আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার পঁচাত্তর বছর সংখ্যার মলাট বা প্রসাধন মুখ, চোখ, নাক, ঠোঁট—সখা চুম্বন দাও। কিন্তু এ আমরা চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম প্রাক্তন ছাত্র খ্যাত শ্রীসত্যজিৎ রায় এর প্রচ্ছদ আঁকুন। কিন্তু শ্রীরায় আমাদের হতাশ করেছেন এবং তারপর যা হয়, বৃষ্টি পড়িতেছে আর আমরা অদ্রীশের স্মরণাপন্ন হয়ে প্রচ্ছদ আঁকার তোড়জোড় শুরু করলাম। রঙ তুলি নিয়ে প্রায় কুস্তি করে যখন খান কয়েক ভাবনা চিন্তা তৈরী, সে সময় জানা গেল অর্থ সংকট। রঙ চঙ বাদ। শুরু হল নতুন ভাবনা চিন্তা। সময় বয়ে যায়; চারপাশের চাপে ম্যাগাজিন বের করার যাবতীয় সাধ-আহ্লাদ জরাক্রান্ত, মৃত্যুমুখ প্রায়। অমিতেন্দু লড়ছে, অদ্রীশ লড়ছে, অভীক লড়ছে, প্রেস, কাগজ, বিজ্ঞাপন, টাকা আর ব্যক্তিগত প্রেম, প্রীতি, প্রত্যয়কে টপকে টপকে। সময় বহিয়া যাইতেছে অধঃ, নিচ, ঈষাণ কোন হইতে কোনে। প্রচ্ছদ বুঝি হয় না। এই সময় অকস্মাৎ একদিন আমাদের প্রকাশক শ্রীদেবাশিসের স্বপ্ন দর্শন হল। শেষরাতের স্বপ্ন, ফ্রয়েড বলেছেন সত্য হয়। সে স্বপ্নে দেবাশিস দেখল আমাদের অর্ধসমাপ্ত ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়ে গেছে। চারিদিকে জমি দখলের মত সাড়া আর ক্যান্টিনে এক কোনা থেকে পত্রিকার ইংরেজি বিভাগের সম্পাদক অভীক ছুটে এসে দেবাশিসের কলার ঝাঁকিয়ে দারুন উত্তেজিত ভাবে ম্যা[illegible]একটা পাতা দেখিয়ে বলতে লাগলো, 'এখানে একটা জ্যান্ত কাক ছিল, সেটা কোথায় গেল?' [illegible]শুনে বিস্মিত, হতবুদ্ধি কিন্তু অভীক নাছোড়বান্দা, তার সেই কাকটা চাইই। স্বপ্ন শুনে সম্পাদকরা [illegible]ই হোক একটা কাককে রাখতেই হবে। স্থান নির্বাচন হল প্রচ্ছদ। অদ্রীশ গেল কাক আঁকতে। [illegible]কি, সাদা, পাংশু যাবতীয় হাফটোন কাকেরা হাজির প্রায়, হঠাৎ অমিতেন্দুর খবর—'ব্লক বানানোর [illegible] দেবাশিসের শেষরাতের স্বপ্ন দর্শন সত্য হবে না! অবশেষে খুব দুঃখে ঠিক করা হল, ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা হবে এ কাক কাহিনীর চক্রান্ত। এ চক্রান্তে কোনো বোফর্স হয়নি কিন্তু বড় ম্যাগাজিন, টাকা বাকি, দেনা আছে মাথার উপরে তবু হয়েছে শুধু একটাই মর্মান্তিক ঘটনা, অভীকের সেই জ্যান্ত কাকটাকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। সে সম্ভবতঃ উড়ে গেছে আরো টাকার দাবিতে কর্তৃপক্ষের টেবিলের দিকে ...

093.7
P926M4
v.59

WITH BEST COMPLIMENTS

OF

A WELL WISHER

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

খণ্ড—৫৯ ১৯৮৯

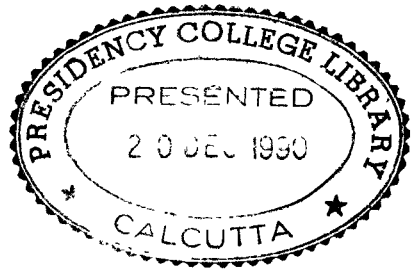

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ঃ স্বরাজব্রত সেনশর্মা, কাজল সেনগুপ্ত, দেবাশিস সেন

প্রকাশন সচিব ঃ দেবাশিস দাস

সম্পাদক ঃ অভীক বর্মন, অমিতেন্দু পালিত, অদ্রীশ বিশ্বাস

J93.7
P926M4
V.59

স্মৃতিচারণ

সুনীল রায় চৌধুরী

ছাত্র-সম্পাদকের কড়া নির্দেশ, মামুলী দায়সারা গোছের "মুখবন্ধ" লিখলে চলবে না, কিছুটা পাঠযোগ্য সার পদার্থ আছে এমন একটি লেখা চাই। নির্দেশটি শিরোধার্য করে তাই দীর্ঘকাল পরে কলম হাতে বসতে হয়েছে অর্থহীন প্রতিবেদন বা প্রস্তাবের বাইরে কিছু লেখার জন্য।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু লিখতে বসে প্রথমেই মনে হচ্ছে এই কলেজে নিজের ছাত্রজীবনের কথা। আজ থেকে ৪৮ বছর আগে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের কোন একটি দিনে দুরু দুরু বুকে হাজির হয়েছিলাম এই মহাবিদ্যালয়ের চত্বরে। ভর্তির ব্যাপারটা তখন খুবই সহজ ছিল। এখনকার মত কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের সঙ্গে যোগ্যতার পরীক্ষায় বসতে হোত না। মোটামুটি ভাল নম্বর থাকলে কলা বিভাগে আর প্রথম বিভাগে একটু উঁচু নম্বর থাকলে বিজ্ঞান বিভাগে সহজেই ভর্তি হওয়া যেত। মাইনে বাবদ এখনকার ছাত্রছাত্রীরা যে পরিমাণ টাকা দেয়, বোধহয় আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে আমাদেরও তাই দিতে হয়েছিল, যদিও ইতিমধ্যে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে খুব কম করে হলেও ৫০ গুণ!

ভর্তি তো হওয়া গেল, কিন্তু ক্লাশ শুরু হবার আগেই সারাটা দেশ উত্থাল হয়ে উঠলো ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবকে কেন্দ্র করে। নেতারা হয় জেলে গেলেন নতুবা আত্মগোপন করলেন, রেললাইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে গেল, সরকারী কাজকর্ম প্রায় অচল হোল আর দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হলো "স্বাধীন জাতীয় সরকার"! যতদূর মনে পড়ছে, কলেজ বোধহয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ক্লাশ শুরু হোল পুজোর ছুটির পরে নভেম্বর মাসে। একদিকে দেশের এই অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরাজ সহ মিত্রশক্তিদের কোণঠাসা অবস্থা! এই বুঝি ২০০ বছরের ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘ'টে এখানে জাপানী রাজত্ব কায়েম হয়! এরই মধ্যে একদিন কলকাতায় হাতিবাগানে আর খিদিরপুরে পড়লো জাপানী বোমা আর হাজারে হাজারে মানুষ পাগলের মত ছুটলো হাওড়া আর শেয়ালদা ষ্টেশনের দিকে, শহর থেকে দূরে গ্রামের নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। এ সবের মধ্যে দিয়েই চলতে লাগলো পড়াশুনোর চর্চ্চা। পড়াশুনোর পাশাপাশিই চলতো রায় মশায়ের ক্যান্টিনে জমজমাট আড্ডা। তখনও কফি হাউস হয়নি, কাছাকাছি রেঁস্তোরা বলতে YMCA'র কথাই মনে পড়ে। তবে খাবার দাবারের দাম সেখানে কিছুটা বেশী ছিল বলে সাধারণ ছাত্ররা সেদিকে বড় একটা ঘেঁসতো না। এখনকার ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় তখন আমাদের পকেটের অবস্থা থাকতো নিতান্তই করুণ—বাসভাড়ার অতিরিক্ত বড় জোর ২/৪ আনা। বোধহয় আমরা বি. এ. ক্লাশে পড়বার সময় কফি হাউস চালু হোল আর তখন থেকেই রায়মশায়ের ক্যান্টিনের আড্ডা ভেঙ্গে গিয়ে নতুন আড্ডা বসলো কফি হাউসে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রায়মশায়ের ক্যান্টিনের আড্ডা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল। তাই এই আড্ডা ভেঙ্গে যাওয়াটা একটা ছোটখাট সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলে মনে করলে বোধহয় তেমন অতিশয়োক্তি বা অত্যুক্তি হবে না। ঐতিহাসিক বন্ধুরা বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।

খেলাধুলোর ব্যাপারে কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের কোনদিনই তেমন উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল না। ফলে কলেজের মাঠে হকি ফুটবল বা ক্রিকেটের প্র্যাকটিস কদাচিত হতো। এমন কি ইন্টার কলেজিয়েট প্রতিযোগিতায় এই সব খেলায় ১১ জন ছাত্র জোগাড় করে টিম তৈরী করাই কঠিন হতো। এমনও হয়েছে, দর্শক হিসাবে যে ২/৪ জন মাঠে উপস্থিত থাকতো, শেষ পর্যন্ত তাদেরই জোর জবরদস্তি করে মাঠে নামাতে হোত।

তখনকার দিনে, পরাধীন ভারতে, ছাত্রদের মধ্যে ছিল বিপুল রাজনৈতিক চেতনা। প্রায়ই ধর্মঘট হতো, মিছিল করে আমরা নেতাদের ডাকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, ময়দানে বা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমা হতাম। মাঝে মাঝে চলত পুলিশের গুলি আর তাতে প্রাণ হারাত কয়েকটি নির্দোষ ছাত্র। বাইরের এই ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ আমাদের কলেজেও এসে লাগতো, এখানেও হোত ধর্মঘট, ক্লাশ বয়কট ইত্যাদি। তবে তা প্রধানত ছিল স্থানীয় কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে, তেমন কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দাবী নিয়ে নয়। এখানে ছাত্রআন্দোলন গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না, কারণ এখানে তখনও কোন 'নির্বাচিত' ছাত্র ইউনিয়ন তৈরী হয় নি। অধ্যাপকদের সুপারিশে অধ্যক্ষ মুষ্টিমেয় ছাত্রকে 'মনোনীত' করতেন ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা হিসাবে। আসলে অধ্যাপকরাই নিজেদের খুশিমত ছাত্র ইউনিয়নের নাম দিয়ে বছরে ২/১টি মাত্র অনুষ্ঠান করতেন যাতে ছাত্র উপস্থিতি খুবই কম হতো।

আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েটে সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র, তখনও ছাত্র আন্দোলনকে খুব ভাল চোখে দেখা হোত না। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ক্লাশ কামাই করলে স্কলারশিপের পাওনা সামান্য ক'টা টাকা থেকে কিছু কিছু কেটে নেওয়া হোত। স্বভাবতই এসব নিয়ে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র ইউনিয়ন গড়বার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠল বেশ কিছু ছাত্র। (তখনও কিন্তু কলেজে কো-এডুকেশন চালু হয়নি—ফলে কলেজে একটিও ছাত্রী ছিল না)। কর্তৃপক্ষ কিছুদিন গড়িমসির পর ছাত্রদের দাবী মেনে নিলেন, তৈরী হোল নির্বাচনের ভিত্তিতে ছাত্র ইউনিয়ন গড়বার সংবিধান। তারপর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হোল এই কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম নির্বাচন। এই কলেজের পক্ষে তো বটেই, কলকাতার অথবা সারা ভারতের ছাত্র আন্দোলনের পক্ষেই এটি নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সে যুগের Class Representative (CR) নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল আজকের থেকে একেবারে অন্য ধরনের—Proportional Representation with single transferable vote. প্রথম নির্বাচিত General Secretary হলেন বর্তমান ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সেই সময়ে অর্থনীতি অনার্স ক্লাশে আমাদের সতীর্থ ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রী সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। এখনও সে যুগের বন্ধুরা একত্র মিলিত হলে আমরা সেইসব আনন্দের ও গৌরবের দিনগুলির কথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করি। যতদূর মনে পড়ে, প্রথম বা দ্বিতীয় বছরে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন আমাদের আর একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইংরাজী অনার্সের ছাত্র শ্রী সুধীন গুপ্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজের সে যুগের বিস্তারিত ইতিহাস লেখা হলে এঁরা অনেক তথ্য দিতে পারবেন বলে মনে হয়।

কলেজের ইতিহাসে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও আমাদের ছাত্রজীবনে প্রথম চালু হয়েছিল—সেটি হোল Co-education বা সহশিক্ষা। ১৯৪২-৪৩ সালে আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে পড়ি তখন অল্পদিনের জন্য একটি ছাত্রীকে যেন প্রথম দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে। তখনও কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে বা নিয়মিতভাবে সহশিক্ষা চালু হয়নি। বি. এ. ক্লাশে পড়ার সময়ে শুনতাম, এ বিষয়ে প্রস্তাব বিবেচিত হচ্ছে, অধ্যাপকদের মধ্যে একদল এ ব্যাপারে প্রবল বাধা দিচ্ছেন বা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ইত্যাদি। এ সবের ফাঁকে কবে যে সরকারী সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত

রূপ পেয়েছিল অতটা আমাদের জানা ছিল না। তাই একদিন যখন আমরা ফোর্থ ইয়ারে পড়ি, আমাদের অর্থনীতি বিভাগের অত্যন্ত জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষালের সঙ্গে হঠাৎ একটি ছাত্রীকে ক্লাশে ঢুকতে দেখে খুব আশ্চর্য হলাম। কলা বিভাগে ফোর্থ ইয়ারে মাত্র ১ জন এবং বিজ্ঞানে আর ৩ জন ছাড়া থার্ড ইয়ার ক্লাশেও ৫/৬টি ছাত্রীকে নিয়েই বোধহয় শুরু হোল কলেজের জীবনে একটা নতুন যুগ! এখনকার ছাত্রছাত্রীরা শুনে আশ্চর্য হবে, তখন অধ্যাপকরা মেয়েদের কমন রুম থেকে ছাত্রীদের সঙ্গে করে ক্লাশে আসতেন এবং ক্লাশের শেষে আবার তাদের কমনরুমে পৌঁছে দিতেন—যেন ছেলেরা সব বাঘভালুক এবং তাদের হাত থেকে নিরীহ মেয়েদের রক্ষা করার মহান দায়িত্ব অধ্যাপকদের। এ কথাটি অবশ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্পর্কে ততটা প্রযোজ্য ছিল না, যতটা অন্যান্য কলেজগুলি সম্পর্কে যেখানে সহশিক্ষা তখন চালু ছিল। ভাবতে আরও মজা লাগে, এই সব কড়া পাহারা এড়িয়ে কোন ছাত্র কোন ছাত্রীর সঙ্গে ২/৪টা কথা বললেও অধ্যাপকদের একাংশ তাদের ডেকে নিয়ে উপদেশ দিতেন—ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের মেলামেশা একেবারেই অবাঞ্ছিত। ২/৪টি ক্ষেত্রে এই আলাপ ঘনিষ্ঠতার গণ্ডী ছাড়িয়ে ভালবাসায় পৌঁছেছিল কিনা এবং পরবর্তী জীবনে তাদের মধ্যে স্থায়ী কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিনা, এ বিষয়ে নাকি ইতিহাস বিভাগ, যারা কলেজের ইতিহাস নতুন করে লিখবার উদ্যোগ নিয়েছেন, অনুসন্ধান চালাচ্ছেন! তাঁদের এই উদ্যম সফল হোক!

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামগ্রিক চরিত্রের দিক থেকে আর একটি বড় ধরনের বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনও আমাদের ছাত্রজীবনে প্রথম চালু হয়েছিল। এই বিষয়টির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে এবারকার মত আমার বক্তব্য শেষ করবো। '৪০ এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. বি. এসসি ক্লাশে পাস ও অনার্স দুই-ই পড়ানো হতো। এই দশকের মাঝামাঝি, বোধহয় সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবার সময় থেকেই নিয়ম হয়, এখন থেকে এই কলেজে শুধু অনার্স নিয়ে পড়ানো হবে—পাসকোর্সের ছাত্রছাত্রীদের আর কোন স্থান হবে না প্রেসিডেন্সি কলেজে, অর্থাৎ অনার্স ছেড়ে দিলে অথবা কাউকে অনার্স ছাড়িয়ে দিলে তাদের ট্রান্সফার নিয়ে অন্যত্র যেতেই হবে। আমাদের সময়েই অর্থাৎ এই ব্যবস্থাটি চালু হবার পর প্রথম বছরে, ২/১টি ব্যতিক্রম যে হয়নি, তা না; তবে মোটামুটিভাবে এই ব্যবস্থাটি তখন থেকেই পাকাপাকি ভাবে চালু হয়েছে। সহশিক্ষা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থাটি কেন চালু করা হয়েছিল—দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল কি? ব্যাপারটি নিয়ে ইতিহাস বিভাগ একটু অনুসন্ধান চালালে হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যেতে পারে!

কাজ যখন শুরু হয়েছিল শীত তখন জাঁকিয়ে বসছে। কাজ শেষ হবার মুখে শরতের পদধ্বনি। দুই ঋতুর মাঝে প্রায় একটি বছর—প্রুফ, কলম, কালি, কাগজ, ব্লক আর বিজ্ঞাপন নিয়ে নিঃশব্দে সরে গেছে।

বিলম্বের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অবশ্যকর্তব্য প্রারম্ভেই সেরে রাখছি। বিশ্লেষণে যাবার প্রয়োজন সম্ভবত নেই, কি কি কারণে প্রকাশনায় সময়ের অপব্যয় হয় তা প্রায় সবাই-ই জানেন। বড় কথা এই যে যাবতীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনার স্মারকদের দু'মলাটের অভ্যন্তরে আনা গেছে। নিয়মিত পাঠক মাত্রেই বুঝবেন এ'বারের পত্রিকার আয়তন, বিশেষতঃ বাংলা বিভাগে অন্যান্যবারের তুলনায় অনেক বেশি। গুণগত উৎকর্ষই ছিল নির্বাচনের প্রধান মাপকাঠি এবং আমাদের বিশ্বাস আয়তনের স্ফীতি সত্ত্বেও উৎকর্ষের মর্যাদাহানি হয়নি।

কার্যক্ষেত্রে অহেতুক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সম্পাদনার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল উপভোগ্য। এ এক সম্পূর্ণ নতুন এবং অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। অসংখ্য ভালো লেখা এসেছে যা পড়ে আমরা যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র হিসেবে আমরা এখন কলেজ জীবনের সায়াহ্নে। প্রথম যখন আসি ক্যান্টিন ছিল গমগমে, সিনিয়রদের সঙ্গে অনাড়ম্বর আড্ডা, রসি কতায় পলকের মধ্যে এগিয়ে যেত সময়। আলোচনাই ছিল মুখ্য, বিষয় নয়। ক্রমশ দিন এগোলো। আমরা কলেজ চিনেছি চা, ঘুগনি, প্লেন চামিনারের ধোঁয়ায়। এখন নতুনদের সামনে চাউমিন, পেপসি, উইলস। আশঙ্কা ছিল স্বাভাবিকভাবেই কারণ আমরা এগোচ্ছিলাম হাওয়ার বিরুদ্ধে। প্রকাশনার অন্তিম পর্বে এসে আমরা শঙ্কাহীন, আনন্দিত। ছাত্ররা উজাড় করে দিয়েছে সহযোগিতা, স্বতঃস্ফূর্ত অকৃপণভাবে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এটা প্রকাশনার ৭৫ বর্ষ। জানিনা ইতিহাস সঠিকভাবে মর্যাদাপ্রাপ্ত হল কিনা। সৎ চেষ্টাই ছিল আমাদের একমাত্র মূলধন। আমরা চেয়েছি বর্তমানের গণ্ডী ছাড়িয়ে পত্রিকাকে ভবিষ্যতের সম্মুখীন করতে। দাবির যাথার্থ্য বিচার করবেন পাঠকরা। আমাদের তরফ থেকে রইল আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বিনীত—

অমিতেন্দু পালিত

অদ্রীশ বিশ্বাস

CONTENTS

From the Secretary's Desk	i	Debashish Das
Editorial	ii	Abheek Barman
Family Planning and Status of Women	1	Nairanjana Dasgupta
Science and Anti-Science	3	Parikshit Ghosh
The International Brain Drain : a Pandora's Box	7	Tathagata Chatterjee
Political Economy of Indian Agriculture	9	Ranjanendra Narayan Nag and Gora Ganguly
Writing for the Magazine : The Tao of Nonsense	12	Ananish Chaudhuri
Crisis and Cognition	14	Shiladitya Sarkar
Man The Symbol—Monger	18	Swarajbrata Sengupta
An Ode	21	Sibani Sengupta
Mathematics of Historical Materialism	22	Santanu Mitra
Comments on Marx's Theory of Alienation	29	Baijayanta Chakrabarti
Beyond Babel or What Is It Like To Be You ?	32	Abheek Barman

Family Planning and Status of Women

Nairanjana Dasgupta

Overcrowding is now a way of life Most of us deal with it with a kind of pained shrugged indifference Though in an unconscious way we are aware of it, we are not interested in looking at it as a problem It does not seem to concern us somehow However, a look at the population statistics gives us a jolt According to demographic data, the world population is increasing at a rate of 1 7 percent per annum This means that at our present rate we shall double our number every 35 years The enormity of the situation is clear only if we consider this in the perspective of development of the human species

The rapid growth of population is putting immense pressure on the earth s resources, environment and even the social fabric The petroleum crisis may be taken as an example The world petroleum production has more or less levelled off, and with the rising rate of population, oil supply per person is falling at the same rate at which population is increasing Further, food production may soon fall below the rate of population growth Africa already faced a 14 percent decline of food production in the seventies Further, floods, land-slides, green house-effects, depletion of the ozone layer and freak weather are all products or by-products of this immense growth

However, recently there has been a consensus, at least at the academic level, that this growth, far from being a blessing, is a curse All thinkers and policy makers seem to agree that steps must be taken to reduce this fantastic growth rate Since growth rate is crude birth rate minus crude death rate, the only practical solution is to bring down the crude birth rate (Raising the death rate, though logically possible, is unthinkable on humanitarian grounds) It is in this context that the concept of *Family Planning* arises

Family Planning is a measure by which births are controlled and proper spacing of births is done using various scientific devices Lately in many countries, induced 'abortion (i e deliberately getting rid of the unborn foetus) is also a part of this measure

Considering the immense population and the rapid rate of growth, family planning seems to be the optimal solution, though whether it is the best solution is open to debate The main problem of this campaign is the difficulty in implementing it Mere opening of FP clinics and making birth control devices available to people is no solution The most important thing is to create a general awareness and the needed motivation among the people Unless people themselves realize the problem, decide to have smaller families and opt for FP devices, success of this campaign will be bleak Thus, the human element is the most important factor for the success of this campaign Accordingly, the World Population Conference in 1974, held at Bucharest, identified the following as being necessary for the success of FP and population stabilization

(1) Reduction in infant and child mortality,
(2) expansion of basic education, especially for girls,
(3) raising the status of women,
(4) equitable distribution of income and benefits of economic growth,
(5) postponement of marriage

In other words, for the FP campaign to be at all successful, there must be vast infrastructural changes The most important elements are human beings who are the means and ends of this campaign It can be clearly seen that women are given a special mention in the Bucharest declaration This is because women are the ultimate child bearers and their decision regarding the size of the family is of utmost importance It is usually seen that women are generally reluctant to use the FP devices This antipathy has roots deeper than in mere fear or general ignorance The explanation is complex and psychological

Judith Blake gives a very good theoretical explanation for this reluctance Her explanation is based on the 'status element According to her, women generally tend to prefer *an adequate number* of sons This number often makes the family size too large According to Blake, women have essentially a *derived status* They are expected to participate throughout their life cycles in terms of kinship attachment to *men*— early in life to father and later in life to husband Further, the usual concept of family, until very recently, was a working father, a home-maker mother and children at home The wife or mother was economically dependent on her husband She had no independent status She was her father's daughter or her husband s wife This male domination made her believe that males meant security and thus she preferred a son to a daughter As a result, she wanted an adequate number of sons for her security

This skewed pattern of economic independence and dependence is a product of many causes Industrialization, social taboos, social changes, religious barriers have all contributed to this skewness Till the middle of the 20th century, such a situation remained with very few exceptions. However, in the middle

of this century, women's education was broadened and employment opportunities increased Many educated, enlightened women revolted against such a system and demanded an independent status There, too, they faced an inflexibly structured choice—family or career Face to face with such a choice and with a natural desire for security, most women opted for the former The handful who chose the latter went against their natural instincts and had the feeling of having 'lost out something in life', as Betty Friedman astutely puts it Hence we see that this struggle for a status in a way influenced the FP campaign Those women who opted for family tended to want sons with a renewed fervour and the FP campaign met with little success

Thus, we are apparently facing an insoluble problem For the FP campaign to be a success, the human element must come forward to implement it—especially women Psychological pressures however, alienate the average woman from this movement and hence we reach a point of stagnation

But there is a point of optimism Population stabilization, which is our ultimate goal, has been achieved in quite a few countries in the world These countries have gone in for small families and have attained a growth rate of 0 15 percent Interestingly enough, these countries, viz West Germany, Luxembourg, U K, U S A Japan, East Germany, Austria, etc , never gave priority to FP as a national policy FP was the outcome of development All these countries are highly industrialized, have nearly cent percent literacy rate and have a very high rate of female participation in employment In most of these countries, an ideal new family has emerged—working parents, who are both economically independent, and one or at most two children at home The rigours of employment give a woman much less time to devote to her children and, as a result, she has opted for fewer children Thus, without any active FP campaign, these countries have achieved the ultimate target of population stabilization

China is another important achiever in this field China's leaders have realized that unless drastic measures are taken, the country will be reeling under the crisis of over population The Chinese norm is a one child family At the national level, marriage laws have been drastically changed, the marriage age raised and the status of women consciously increased Further, birth quota and birth rationing were introduced Parents having a single child and who do not want to have any more are given many advantages Housing, schooling education, employment facilities pension benefits and increased rations are provided At the same time parents with more than one child are penalised in many ways These measures have been very effective and have brought down the birth rate The Chinese aim is to reduce the birth rate to 0 5 percent by the end of the century and, at her present pace, China will soon achieve her goal of stable population—though at the cost of large-scale infanticide, dissatisfaction and abortions

If we remember these "success' stories, the Indian scene will be found to be in a sorry state With 2 4 percent of the world s land and 15 percent of the world population and a growth rate of 2 25 percent, India is facing a grave crisis As early as 1952, Family Planning was adopted as an objective on the national level, but we are yet to hear of any significant achievements The major reasons behind this are poverty, ignorance unequitable distribution of economic development and the bareaucratic nature of the FP campaign in India Our Government has spent a large amount of money in giving media coverage and opening FP clinics all over the country However general ignorance and abject poverty have made it difficult to create a general awareness among the people Further, the status of women in India is very low Indian males have made little or no allowance for the majority of Indian females to enjoy the benefits of education Women generally are illiterate unaware and victims of male domination The active participation rate of women in employment is only about 12 percent which is very low by all standards Given such a skewed low status, the only specific function of a woman that remains is child-bearing It is only natural that she would not like to forego her natural right for any purpose ,however noble As a result women are reluctant to go in for FP and tend to prefer large families Under these circumstances, unless massive infra-structural changes are made and a general awareness is created among the masses, population stabilization will remain a faraway goal to achieve in India

Thus we see that we have a problem—that of over population We also have an optimal solution—population stabilization through FP campaign But this solution can only be implemented if some conditions are fulfilled These conditions are often very hard to achieve in real life However, in many countries such an ideal situation has been achieved Given time, opportunity and will, the ideal situation may be realized Infrastructural changes spread of education, economic independence of women and, above all, compromise on the part of both males and females will all contribute to make the solutions implementable The most important requirement is general awareness, because neither coercion nor economic benefits will be able to make the ideal situation sustained There must be willingness on the part of the individuals in the system , they must be aware of the situation and must make an effort to ease the burden of over-population We should remember that we have not inherited the world from our fathers but are borrowing it from our children For the sake of future generations, we must make the sacrifice.

Science and Anti-Science

Parikshit Ghosh

"Knowledge is but the struggle for knowledge"
—Ramon Sender

(Any person who has gone through schools and exams will realize the truth in the above statement This essay, however, is concerned with the struggles of scientists and philosphers, not school-children)

1 We live, it is nowadays often said, in an 'age of science' The allegedly profound influence of science on our lives can be thought to have two aspects—one material and another psychological The material aspect is one which has grown out of technology—that doubtful offspring of science (Is science its real father ?—we shall return to this question later) Nowadays, we can hardly think of life on earth without electricity, test-tube babies, or hydrogen bombs The psychological influence, on the other hand consists of changes in the ordinary man's way of thinking, acting, and looking at the world, changes which might have been brought about by science But over and above these, science also has a *political* impact While previously it was the Church which acted as guardian to the State, it is now gradually being replaced by the institution of science Modern day rules are far more influenced by their Manhattan Projects or Council of Economic Advisors than, say, the pronouncements of the Archbishop of Canterbury (in our country though, the case seems to be different)

However, there is yet another sense in which our present century is labelled as a scientific epoch It arises from the belief that in the past hundred years or so, science itself has achieved giant strides forward and reached new frontiers hitherto not even dreamt of Indeed, some go so far as to say that science has unravelled nearly all the mysteries of the Universe We must examine the very anatomy of science and understand its *modus operandi* before we can ascertain the justifiability of this claim

2 Inspired Rationalists like Descartes thought that Reason, and Reason alone, can provide knowledge But science tells the story of a 'real' world lying outside us Also, scientific theories are supposed to take the form of 'universal statements' (i e statements unrestricted in space or time) Hence neither isolated historical 'facts' (e g 'Akbar became Emperor in 1556 A.D') nor purely logical or mathematical truths (e g, There are an infinite number of prime numbers') can qualify as *scientific* theories The scientist trades in timeless statements about the state-of-the world

Since science deals with *external* reality, it must be grounded on experience, and not *merely* on reason and introspection This notion led many philosophers to express the view that the task of the scientist is to make patient and careful observations, and then proceed from these, by way of inductive generalizations, to the universal theories which are the aim of science Hence, science is little more than meticulous entries into our ledger-book of experience Francis Bacon spoke of perceptual experiences as the "countless grapes, ripe and in season' from which the wine of science is to flow.

The problem with this purely inductivist view is the essential arbitrariness of the process of induction itself As David Hume pointed out, there can be no *logically demonstrative* way of knowing when and how generalizations can be made from observations Moreover such generalizations are bound to run the risk of being proved wrong in the future An observation or singular statement (e g, 'Today sunrise has been observed) can never guarantee the truth of universal statements induced from it (e g 'the sun rises everyday') It is perfectly natural for the Eskimo to think that all ground is ice—only, he would be fatally mistaken

Moreover, many of the concepts and entities that modern science has thrown up, are unobservable ones (e g electrons, genetical mutations, etc) Surely, while thinking about them, something more than mere observation was at work All this points towards the fact that the scientist not only watches, but also thinks, contemplates and speculates

3 After the advent of Newton, the physical sciences left their cradle and suddenly reached adulthood The philosophy of science could no longer manage to remain the same The inductivist view was turned upside down and the path of logical deduction was conceived to run not from facts to theories but from theories to facts

In other words, the task of science—it was argued—is not the "collection of facts" but discovering the "connection between facts' Scientists are to propose general hypotheses from which, by way of logical deduction, various predictions about real world events can be derived It can then be checked if such predictions conform to actual phenomena (whether already known, or yet to be systematically observed) and if they do, the theory is considered to be validated, otherwise rejected This has generally come to be known as the 'hypothetico-deductive model' of scientific theories

Admittedly, low-level empirical laws are still nothing more than generalizations on directly observed regularities in nature But the 'grand' purpose of science is now conceived to be the designing of 'linking theories that bring together apparently diverse phenomena under the purview of a single universal law In other words, our numerous and incoherent perceptions are sought to be synthesized into a single and coherent conception of the world Perhaps the first instance of such a truly unifying theory was provided by Newton when he showed that apparently such disconnected events as the falling of the apple and the movements of the moon are only different manifestations of the same phenomenon , and such established empirical laws as Galileo s law of falling bodies or Kepler's laws of planetary motion can really be explained by (i e , deduced from) a single universal principle—the law of gravitation

A crucial difference must here be made between what is known as the 'context of discovery' and the 'context of justification' It is not denied, under this view, that the scientist, before setting about his task of theorizing, is profoundly intrigued and motivated by his observed peculiarities of Nature Indeed, his enterprise arises out of the attempt to come to grasp with these peculiarities (Thus, Newton was stirred by the problem of the falling apple, or Einstein by the Morley-Michelson experiments on light) The point that is being stressed, however, is that the *construction* of theories is essentially an *illogical* process involving flights of fancy and imagination (like in painting or composing) It is an attempt to solve Nature s jig-saw puzzle—as in the case of all such puzzles, there is no definite *method* for solution It is only *after* hypotheses have been proposed, that we can analyze them by the instruments of formal logic and also throw on them the torchlight of experiment and observation Thus not the construction, but the issue of possible 'justification' of theories lends itself to rational discussion The progress of science, therefore, depends on those very "anticipations, rash and premature which Bacon urged scientists so much to avoid The position is excellently expressed in the words of Novalis when he says "Hypotheses are like nets , only those who cast will catch" So, to do science, we have to do more than keep our eyes open

4 It turns out that there is no fool-proof method of *formulating* scientific theories But even after such a theory has been set up (by whatever conjuring action of a fertile imagination), can we really be sure about its validity, by checking its results against actual experience ? In his 1934 masterpiece "The Logic of Scientific Discovery" Karl Popper shows that the *verification* of scientific doctrines is impossible , the only sure judgement we can ever obtain regarding their empirical status is one of falsification The argument is essentially the one which shows the impossibility of a logically demonstrative induction

Suppose we suggest the law "All swans are white" Next, to judge its truth or falsity, we go about observing all the swans that come across our way Also, suppose we continue to meet only swans of white plumage Can we ever conclude with certainty that non-white swans do not exist ? The answer is clearly no, because nothing prevents the possibility that one day, we may run against a genuinely black swan On the other hand, sighting of a single black swan will unambiguously contradict the proposed hypothesis, and lead to its immediate downfall Speaking more formally, if an observation or singular statement (the consequent) is derived from a scientific law or universal statement (the antecedent), and if the singular statement is seen to be false, then it is perfectly valid to 'deny the antecedent' using the instrument of formal logic called *modus tollens* However, to 'affirm the antecedent' from the truth of the consequent is a well-known, but often repeated, logical mistake

The import of all this is significant It implies that there can be no certainty of truth in science, only a certainty regarding ignorance Currently accepted theories are merely those which have *so far* resisted falsification and have thereby earned some of our confidence and good-character certificates In the future, however, a possible falsification from an unexpected direction may well send them to exile and oblivion (or else, merge them into 'more general' theories, just as Newtonian physics became included in Einstein's theory of relativity) Hence, the essence of science—as opposed to anti-science like religion or dogma—is its skepticism Scientists propose theories with greater and greater 'degrees of falsifiability' and experimental scientists put them to more and more merciless tests , progress is attained through this process of putting

forward 'bold conjectures' and critically attempted 'refutations' Popper goes far to make it clear that science can never be a body of cut-and-dried knowledge—to be really fruitful, it must have Damocles' sword of 'refutations' hanging over its head

5. In spite of many difficulties discussed so far, the prospect of attaining *objective* knowledge *through our senses* has not yet been questioned That is, we have implicitly accepted the 'bucket theory of the mind' the view that the mind is a passive vessel for collecting raw sense-data It was the German philosopher Immanuel Kant who, in his ' Critique of Pure Reason" (1781), first drew attention to the inevitable subjectivity of all 'objective' knowledge Phenomena are formed, argued Kant, as a result of the encounter between the forms of our sensory intuition and external events involving 'things in-themselves' Hence our observations are as much a product of mind as of matter Thus, scientific concepts are not really read *out of* experience , rather, they are read *into it* Just as in astronomy Copernicus showed that the apparent motion of stars are reflections of the earth's own motion, Kant tried to show that in science, the subject doing the knowing constitutes to a considerable extent, the object When we consider this, even a neat and-clean 'falsification' of theories seems elusive

Recent philosophers have realized not only the subjective character of even our barest sense perceptions, but also the changing nature of that subjectivity All observations are profoundly laden with theory—they employ a set of implicit beliefs, assumptions, prejudices and even ideology, which constitute the 'observation language' Indeed, meaningful observation is impossible without such a language The various conventions of measurement, classification, and interpretation of data are the elements out of which the 'observation language' takes shape Isolated theories, therefore, can hardly ever stand on their own feet—they acquire meaning only when placed in the context of some larger 'theoretical system which has a complete armoury of an observation language at its disposal

Thus, with the developments of both science and its philosophy, it has increasingly become realized that intellectual conflicts in science are conflicts between entire theoretical systems or world-views, rather than between isolated single theories But each theoretical system has its *own* distinctive observation language, and so the conflict cannot be resolved merely by taking recourse to experiments and 'naive falsifications'

Moreover, every theoretical system at its *initial* stage of development, is invariably tentative and fuzzy, self-contradictory and also apparently in contradiction with 'facts'—a'l this particularly because it lacks a well-defined observation language for itself However, with time and with the construction of new conceptual pillars, the void may be filled and the ugly duckling may grow into a beautiful swan As Paul Feyerabend argues in his rather mischievous book, "Against Method', the history of science is indeed replete with such examples When Galileo was vigorously defending the Copernican heliocentric theory, his opponents—the Ptolemians—used an interesting argument to 'prove that the notion of the earth's movement is pure nonsense If the earth indeed moves—the argument went—then a stone dropped from the top of a tower would have fallen not at its bottom, but some distance apart, because during the time of its fall, the earth (along with the tower) must have moved some distance away This argument *then* seemed convincing, but the principles of Newtonian dynamics (formulated much after Galileo) *now* explain to us that the stone *shares* the earth's motion, so that the only motion perceptible to the observer on the ground is the motion of the stone *relative* to that of the earth, i e a vertical fall Newtonian dynamics, therefore, provides a suitable observation language without which the heliocentric theory is lame, as indeed it was during the period of its conception by Copernicus or Galileo.

6. So what emerges from the discussion is this there is no fool-proof *method* of scientific discovery. Hypotheses have to be plucked out of thin air, and even *after* they have been proposed, it is terribly difficult to judge their worth There can be no certainty regarding what is true in science, nor even certainty regarding what is false Even our sense perceptions cannot be our trusted friends Many a trusted 'science' of the past has been relegated to the status of obscure mythology, and many ideas—once dismissed as absurd—have later been hailed as the Golden Truth Therefore, the essence of science is Skepticism, but scientists have to be skeptical even of their *own* skeptical attitude

What, then, separates science from anti-science, from mysticism and dogma ? Surely, it is not its truth content, because 'ultimate truth' always eludes us The characteristic which sets science apart is its distinctive *approach*, its tireless self-criticism and self-correcting mechanism, and its refusal to take any notion granted for ever (or for its own sake) We can never reach the One Great Truth, but we can participate, if

we choose, in the One Great Search for it The main charge against such pseudo-sciences as astrology is not that they are false (because, after all, who knows ?), but that their practitioners have made their systems inert towards all forms of rational and critical self-examination Such doctrines illustrate not the 'wish to know but the 'will to believe'.

We started with the question of the achievements and the influence of science, and have concluded that the achievements can never be final or complete But the major popular influence of science in our age has created quite the opposite impression, particularly through the medium of education Thus, theories *currently* fashionable are handed out as the ultimate gems of knowledge—science is taught with an aura of certainty that kills its very spirit Such irrelevant subjects as metallurgy or economic geography are thrashed out in high school text-books, but not a word is uttered on methodological problems, or the nature and limitations of human knowledge In schools "one does not say . *some people believe* that the earth moves round the sun one says the earth *moves* round the sun—everything else is sheer idiocy (Feyerabend) Such an unquestioning stance is not science but anti-science Moreover, under the influence of too much 'scientism , a belief is often marketed, that questions of ethics, aesthetics or metaphysics are really superfluous—every human problem can be solved (or every happiness earned) by some mathematical formula or mechanical gadget It is perhaps as a reaction against this vulgar narrow-minded materialism which scientific education and technology has precipitated that movements like surrealism sprang up in the Arts (whereby Reality is banished, and Reason made to go on forced leave)

The amazing success of technology in recent times is sometimes taken as proof of a *genuine* advance of science An example will deal a tragic blow to this line of thought There is little evidence to suspect that the knowledge of mechanics possessed by the ancient Egyptians had attained any appreciable degree of sophistication Yet, the pyramids remain to this day an astonishing engineering feat Just consider this the Great Pyramid of Cheops in Giza is built of limestone blocks that are 7 ft high, and sometimes as much as 18 ft long, and which often had to be quarried *across* the Nile Some of the joints are, even now, so fine as to be able to 'pinch a hair' , and the four sides of the base (each about 755 ft) show an average variation of only six-tenths of an inch ! All this was done 2,500 years before the birth of Christ (and how many years before the birth of Newton is left to the reader to calculate)

That society does not always tolerate the 'free competition of thought' which science demands was evident from the predicaments of poor Galileo In recent times, forces eager to maintain intellectual (hence social ?) *status quo* are no less active Only, they adopt throttling methods that are much more indirect, subtle and sophisticated '(e g education and brain-washing)

Therefore Science and Society are often like square pegs and round holes For their mutual benefit and progress, it must be preached and realized that science is a never-ending enterprise, and perhaps (to quote Camus, albeit from a different context) also a "never-ending defeat Whether that is lamentable is doubtful , for we must remember the wise man who complained of a nightmare—he dreamt that all truths in the Universe were known !

The International Brain Drain : a Pandora's Box

Tathagata Chatterjee

How does it feel/To be on your own/
With no direction home/Like a complete unknown/
Like a rolling stone ?

Bob Dylan

The world is undergoing one of the worst economic crises in it s history It is a crisis that has its origin in the major capitalist powers of the 'center' but has most brutally affected the less developed countries (LDCs) of the 'periphery' which are now experiencing the sharpest economic deterioration in the entire post-World-War-Two era The former indulges in 'primitive accumulation' which implies a simultaneous negative primitive accumulation for the latter—a perpetual phenomenon which Andre Frank has called 'the development of underdevelopment' One subtle but immensely significant factor which contributes to the persistence of the underdevelopment has been the transfer of First and Second World values, attitudes, institutions and standards of behaviour to the Third World nations As a result we find an overall situation of despair and 'vulnerability' This in turn, exacerbates a burning problem widely recognized and referred to as the 'international brain drain' the emigration of skilled people from the LDCs to the developed countries (DCs) Cultural neocolonisation has come of age Indigenous institution-building takes the back seat

At the outset let us note that brain-drain (BD) differs from three other types of emigration from LDCs (i) the 'expulsion' type of migration (ii) the 'exit-from-socialism' type of migration and (iii) the flight-from-authoritarianism type of migration.

The origin of the BD phenomenon can be traced to the Fifties where we find a shift in the immigration policies of major DCs, away from the earlier racial-origin quotas to more equal access by all nationalities For the sake of clarity let us consider a qualified professional hailing from a LDC The DCs vie with each other in picking him up when he is 'ready for the show' They find it cheaper to allow immigrant professionals instead of building and operating, at an annual cost of ten or more million dollars each the extra dozen professional institutes they would otherwise need to prevent a severe reduction in services at their cities.

The onus rests squarely on the home countries. As Dr S Chandrasekhar puts it, 'the intolerance of older scientists in dealing with the younger generations is the main reason for BD' The monolithic bureaucracies in LDCs suffer from infrastructural bottlenecks Frank recognition of talent is sadly amiss In contrast we find total abhorrence of bureaucracy in the academic world a common feature in DCs Add to this the lure of attractive scholarships, greater accessibility of published works in one s chosen field of specialisation, the apparent razzmatazz of a glitzy lifestyle and we stumble upon the reasons as to why the creme-de la-creme of LDCs are putting their best feet forward "Move over a Hamelin-alike land of broken promises' become cult slogans as the steady trail of migration continues unchecked

Brain drain and Welfare Loss

Does a BD 'phenomenon' necessarily imply a BD 'problem' ? This issue has sparked off a series of debates However some answers do crop up Let us define LDCs as 'those left behind by the emigrants' and also define the welfare impact with reference merely to overall income According to Grubel and Scott (1966), as long as the emigration is characterised by Wage = Private Marginal Product (i e the contribution to output, attributable to the gainful activity of the emigrant, in the activity itself) = Social Marginal Product (i e the contribution that the emigrant makes to national income) there will be no welfare impact (adverse or beneficial) on those left behind This is again possible only if we assume the LDC economy to be perfectly competitive In reality, departures from the above-mentioned basic proposition frequently occur, leading to significant loss of welfare A few illustrations can suffice our purpose LDCs as we all know exhibit sticky wages and consequent unemployment Here a domestic distortion leads to divergence between the remuneration and the SMP of the emigrants According to Professor Jagdish Bhagwati, migration raises the expected wage of professionals by both initially reducing the unemployment pool and because emigration brings into the expected wage the substantially higher foreign salaries The increased incentive to secure this professional training, therefore, increases the supply of such professionals beyond the level which would offset the outflow, thus adding to unemployment, rather than diminishing it BD harms the society too An educated elite plays a vital role in society, and the social loss to the LDCs from this drain

has adverse effects far beyond the impact of specialised disciplines The scientist, economist and doctor contribute to political, social and cultural institution-building within the LDC 'They help to establish national values But BD has spawned in its wake a gamut of lethal economic flora—from adding to a sense of national frustration and lowering the sense of worth of those who remain, to reduction of the band of technical personnel who must be at hand when the process of development gathers momentum

Countering the menace

After everything has been said and done one has a feeling of *deja vu* about the whole problem The question which has a million dollar price tag is, can anything be done at all to plug the BD ? It is a seething cauldron on which a lid must be kept Several alternative proposals have been put forward in this regard By increasing salaries, improving research facilities, etc, the LDCs can make emigration less attractive However, it is impossible to converge the gulf in professional facilities on a wide scale when the DCs and the LDCs are so widely apart in their resource endownments Bhagwati and Partington (1976) have proposed to compensate the LDCs for losses caused by the BD by means of a surtax on the LDC professionals income in the DCs of immigration Such a tax would act as a financial disincentive to migrate The DCs should transfer tax revenues to LDCs on the ground that they enjoy gains from the BD and should therefore share their gains for developmental spendings in the LDCs The International Labour Organisation has urged to establish an International Labour Compensatory Facility which would divert the accumulated resources to LDCs in 'proportions relative to the estimated cost incurred due to the loss of labour'

The spectre of BD looms large on LDCs They invest scarce financial resources in the training of professionals only to forego the social returns on that investment as a result of international migration Economic imbalances and incentive distortions straddle societies like scourges Darkness at noon descends Space research languishes in the land of Aryabhatta The time has come to break out from the impasse First of all there should be a structural change in the present system of education It should be tuned to the real needs of social and economic development One hopes that an overhauling of the entire academic set-up would go a long way towards a significant mitigation, if not total eradication of the problem

Notes

1 Bhagwati Jagadish (1985) , Dependence and Interdependence, Chapter 17
2 Bhagwati and Partington, M (ed) (1976) , Taxing the Brain Drain a proposal
3 Castro, Fidel (1983) , The World Economic and Social Crisis
4 Frank, A G (1966) , The development of underdevelopment , Monthly Review 18, No 4
5 Grubel, H and Scott A (1966) , 'The international flow of human capital AER (May)
6 Todaro, M P (1981) , Economic Development in the Third World

Political Economy of Indian Agriculture

Ranjanendra Narayan Nag
Gora Ganguly

Independent India has made fairly rapid strides in the field of scientific and technological development Even in the industrial sector, the achievements have been quite impressive (We will be forced to say very impressive if we believed government statistics) The agricultural sector, however, has generally lagged behind It cannot be denied that agricultural production has increased and a certain measure of self sufficiency has been reached in food grains production , yet this is the sector that harbours the lowest strata of the Indian populace Something is seriously wrong in the state of Indian agriculture Forty-two years after we had supposedly redeemed our pledge, we would do well to scrutinise the state of Indian agriculture today

Indian agriculture fell into decline during the British rule in India The self sufficient village system was systematically destroyed The perpetuation of a decrepit rural economy was seen to be in the interest of the colonial rulers and accordingly, they foisted upon it a system of absentee landlordism The characteristic process of colonial exploitation was carried out fairly ruthlessly in India and expropriated a large number of Indian farmers from their land This led to the emergence of an embryonic class of rural proletariat, the landless labourers These labourers and the small peasants lived in abject poverty In such a situation the agricultural production was bound to decline

This then was the legacy which the Indian government inherited after independence A policy of planned economic development was adopted The foodgrains constraint and the foreign exchange constraint were the most important subjects which the Indian planners initially dealt with To remove the first constraint, India started importing foodgrains on a massive scale but this led to the worsening of the balance of payment problems Hence the planners felt the need to step up agricultural growth rate with a view to securing self reliance in the production of food articles The planners also tried to improve the lot of the lower strata of the agricultural population, the landless labourers and the small peasants Forty years afterwards, they continue to try. What went wrong ?

We would be guilty of oversimplification if we tried to answer this question easily There has certainly been no dearth of planning and yet the agricultural sector continues to be backward The common refrain of the planners have been a good plan badly implemented We, however, tend to believe that the seeds of this bad implementation were inherent in the plan formulations owing to the lack of understanding of the socio-economics of Indian agriculture on the part of the planner. In many a case, however, the crux of the implementation problem is concerned with shabby political interference that acts as a dominant constraint The formulation failures and implementation inefficiences (owing to political interference) tend to reinforce each other and account for the continuation of agricultural backwardness

The planners formulated several different approaches to uplift the agricultural sector Yet, each approach' seemed to have its own shortcomings We shall attempt to analyse briefly each approach and the 'what and 'why' of its shortcomings

The most important measures for direct development of Indian agriculture till date are the introduction of high yielding variety of seeds and fertilizers that ushered in the so called Green Revolution, and the attempts at land reforms

The Green Revolution (GR) did lead to a rise in agricultural production and it is largely due to it that we have assumed an amount of self sufficiency in foodgrains production But here we are confronted with the classic 'growth without development' situation The GR did not, in any visible way, have a significant impact on the backward agriculturists If anything, it led to regional and interpersonal inequalities Indeed, according to some surveys by noted economists, the GR actually led to lowering of real wage of agricultural landless labourers in some regions The reasons that led to the failure of the GR to lead to overall development of the agricultural sector and lift it out of its backward state were many and varied

The GR was heavily dependent on infrastructural facilities (e g irrigation) and hence could succeed only in the infrastructurally better endowed regions Thus, in effect, the GR generated an enclave pattern of growth Secondly the GR was cash intensive (which was obviously a drawback in an already credit constrained sector) and hence could not be afforded by tenant farmers who were already burdened

with high rent The very fact that much of the profits accrued to the rich owner cultivations resulted in the loss of initial momentum of the GR This is so since a major portion of the profit was spent on conspicuous consumption and not ploughed back The GR, according to us, was also susceptible to a sort of realisation crisis About two-thirds or more of the expenditure on new technology flows out of the agricultural sector into the industrial sector, but an equivalent amount of purchasing power does not come back from the latter in the form of demand for agricultural product The industrial population, with an already high rate of urban unemployment, could not expand at a fast rate to sustain agragarian capitalism

Therefore the GR failed to bring about development of the agricultural sector It did precious little to uplift the rural poor and hunger and exploitation still remained

In view of the failure of the tenant farmers to participate in the cash intensive GR we would do well to analyse, in passing, a very serious malady, the credit constraint in the agricultural sector In this sector, production crucially depends on the amount of credit available to the small farmers The planners have largely failed to grant access to the farmers to the institutional sources of credit The rural credit market exhibits the existence of personalised transaction between the money lender (in many cases the owner cultivators themselves) and the small tenant farmers (i e the borrowers) This monopoly power of the village money-lender arises from his intimate knowledge of the borrower s circumstances Therefore, the rate of interest per unit of loans granted is very high and, as a result the farmers cannot undertake the risk of investment

The way to economic development is thought to be by the way of an industrial revolution Accordingly, the Indian planners have sought to develop the industrial sector in India through special attention It had been believed that the spill over effect from this sector would help in the development of the agricultural sector This, however, did not happen to any significant extent There are several plausible explanations

Some economists point to the insufficient linkages between agriculture and industry Industrial growth, according to them, has assumed an autonomous character while agriculture continues to depend heavily on industrial performance The industrial sector may enjoy a high rate of growth, but it will not spill over to the primary sector We can also hypothesize that the nature of agriculture-industry relationship would depend crucially on the relative growth of income and employment in the tertiary sector If income grows faster than employment it tends to generate more demand for industrial goods vis-a-vis agricultural goods Assuming demand as a propellant of growth (which is quite reasonable under a condition of excess capacity) agriculture will be affected

According to some models, the process may be even grimmer The industrial sector s development may actually result in the decline of the agricultural sector In Luxemburg s model capitalist accumulation of surplus value is accompanied and sustained by primitive accumulation, i e, the industrial sector survives and expands primarily due to its ability to impose a system of unequal exchange on the primary sector The industrial bourgeoisie are in a position to force their surplus products on the peasants, what is more, the peasantry is compelled to sell its products at rates dictated by the latter In Emuanuel s theory, it is wages that determine prices As the industrial sector flourishes through transfer of surplus value from agricultural sector, money wage in the industrial sector goes up and so does the unit price of industrial products The terms of trade, therefore, move against the agricultural sector

The brunt of this exploitation is borne by the lower strata of the agricultural populace The adverse terms of trade do not really affect the rural landed interest group The landlords enjoy a guaranteed rate of return from the tenants, particularly when crop sharing practices are widely prevalent in almost all regions We note that even favourable terms of trade do not benefit tenants and small farmers The resulting gains are exclusively monopolised by the surplus raising farmers and their trading partners, small farmers and landless labourers who are net purchasers of grain from the market are adversely affected Thus there is an important asymmetry in the impact of booms and slumps upon the producers of agricultural commodities Therefore, for development in the agricultural sector we should attempt some direct measures

This brings us to land reform , a policy which could have led to overall development had it been properly implemented According to us, the upliftment of the 'backward folk through land reforms would mean a boost to the development process, in the agricultural sector particularly and in India as a whole This would also result in an upward spiral leading to industrial development by providing it with an almost unlimited market

It is not that the Indian planners did not realise the importance of land reforms It was accepted in principle but generally ignored in practice Now, it seems, land reforms are being neglected even in principle

There has certainly been no dearth of efforts This is reflected by the large number of land reform legislations passed in different states of India since 1947 But agriculture continues to remain backward This is largely due to certain inherent weaknesses in the implementation procedure and political interference

One of the major reasons, or should we say the most important reason, for the failure of land reform measures is the general lack of political will amongst the parties in power to implement the measures seriously Almost all parties have sought to maintain the status quo in Indian agriculture, depending on the money power of the large landholders to win elections

Faulty formulation of the land reform legislations is another important reason This provided for loopholes in the legislations and consequent delay in effective implementation of the measures

In some cases the Government might have seriously tried to implement land reforms But one should not forget that the actual implementation of such projects must be done at the district village level And this is the level at which the landed gentry had enough power to block reforms

No policy has had any significant impact on the development process in agriculture It continues to be backward An entirely new approach would probably not be out of place but even proper implementation of some of the existing plans may work wonders Some economists would still prefer to depend on the fiscal and monetary policies designed to raise the saving and investment rates which in turn would help the labour surplus Indian economy to attain a high rate of growth Eventually, they all tend to depend on the trickle down mechanism to help the lower levels of the population But given the skewed distribution of income and assets, the 'trickle down mechanism does not really operate in a significant way Our view is that any one sided stress on fiscal and monetary policies designed to step up the rate of growth, neglecting the more fundamental questions like land reforms is bound to be self defeating

Independent India celebrated her forty second birthday this year Yet she continues to have a backward agricultural sector It is difficult to imagine India making a serious effort to reach a high rate of growth unless overall development of the agricultural sector, on which an overwhelming majority of the Indians depend directly or indirectly for their livelihood, is brought about A serious effort by the Government is urgently needed It is our fondest hope that fortytwo years hence this article would be found irrelevant and out of the context

Selective references for the interested reader

1 A Mitra Terms of Trade and class relations
2 A K Bagchi Political Economy of Underdevelopment
3 M K Rakshit Monetary policy in a developing economy
4 R E V Lucas and Papanek (ed) The Indian Economy
5 S Chakravarty Development Planning The Indian experience
6 D Thorn er . The shaping of modern India

Writing for the Magazine : The Tao of Nonsense

Ananish Chaudhuri

"We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw Alas !
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dry cellar "
—T S Eliot

It was quite unnecessary for me to start this article with the quotation from T S Eliot In fact it was quite unnecessary to start with a quotation at all Moreover I have no idea whatsoever whether the quotation is at all compatible with the contents of the article.

But nevertheless I did so because that is the done thing It adds weight, respectability and a dash of intellectualism (especially Eliot) to an article, moreover people being as gullible as they are (particularly in Presidency College), on reading the quotation, would immediately perceive the author as a veritable intellectual giant It must be pointed out that there has been a remarkable preponderance of Eliot-quotes in recent years Both Subha in 1986 and Anindya in 1988 showed a predilection for the same (the hiatus in 1987 preventing the possibility of more such quotes) I, being the lesser mortal that I am' felt safe in following in the footsteps of these two past editors If the editors, being the exalted personages that they are, quote Eliot, then he *must be the person to quote Though I do not think that many would notice that because there are few* sensible people who, having read the 1986 issue, would deign to read the 1988 one Even if somebody did actually do so, he would surely not touch this issue with a ten-feet barge-pole

However there is no hard and fast rule that you have to quote Eliot (the editorial preference not withstanding) If you do not wish to begin your article with a quotation from Eliot because you (i) have never even heard of him , (ii) have heard of him but never read any of his works , (iii) have tried to read them but couldn t follow a single word , (iv) have a general antipathy towards Eliot and those of his ilk ; (v) none of the above—then you may start with other such equally irrelevant and inane quotations like "Knowledge is but the struggle for knowledge" or "How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn t see ? As long as you can start with a suitably high-sounding quotation you have made a good beginning

Next comes the title The title is important because on it depends whether the reader will go on to read the actual article or not The title must be sufficiently abstruse which will induce the reader to delve into the article itself in order to decipher what you are trying to say Consider such ideal ones like "Class Struggle In The College Canteen' (the article was neither about class nor about struggle but was quite obviously written in the canteen between 1 20 and 1 50 pm) , "Ways of Seeing" (no, not an opthalmologist's manual, dealt with Zen or motor-bike maintenance or something similar), "The Quest For A New Order" (not of the 'scotch on the rocks variety, for heaven's sake, it was socio-econo-politico-historical) and "Sartre, Marx And The Existential Dilemma" (no idea what it was about , couldn t proceed beyond the first three lines)

Once you have a suitable title and a nice, high-sounding quotation you have made a sound start Now what remains is the article itself In general if the title is so abstruse then the article is bound to be an incoherent mass But that is not important What is important is that the article should be esoteric enough so that hardly anybody knows what you are talking of, including yourself The more the reader fails to understand even a fraction of the ideas which you have propounded with such pseudo-eruditeness (the reader of course has no inkling about the 'pseudo part) the more is he convinced about the greatness of your intellect

As Galbraith has pointed out, if we take the familiar or King James version of the Bible, edit out the ambiguities, modernize and simplify the language to accord with contemporary tastes, what do we get ? Certainly a work of lesser influence It is the archaic construction and terminology which put a special strain on the reader so that by the time he has worked his way through, say, Leviticus, he has a vested interest in what he has read because too much effort has gone into understanding it A certain glib mastery over verbiage and the ability to speak sententiously is of the essence Difficulty, equivocation and ambiguity go a long way in adding to the intellectual appeal of your ar icle Thus your primary aim while writing the article is quite clear It should be an example of semantic obfuscation peppered with long-winded sentences and words of not less than seven letters culled tenaciously from a Chambers/Collins/Webster

To give you an example of the kind of prolix verbosity you should aspire towards, let us consider this sentence from John Maynard Keynes's General Theory—"The celebrated optimism of traditional economic theory which has led to economists being looked upon as Candides who, having left this world for the cultivation of their gardens, teach that all is for the best in the best of all possible worlds provided we will let well enough alone, is also to be traced, I think, to their having neglected to take account of the drag on prosperity which can be exercised by an insufficiency of effective demand '

A piece-de-resistance like this emphatically establishes your pre-eminence among the contributors to the magazine

So now you have a clear grasp of the accepted norms and prevalent ethos of the Presidency College Magazine, provided you have persevered till now without showing increasing signs of acute schizophrenia If you are still full of that crusading zeal to fulfil your childhood (or childish ?) ambition of writing for the college magazine then you can proceed straight to your writing table and cough up an article say, on ' The Influence of Kafkaesque Masochism on the Films of Mrinal Sen "

Crisis and Cognition

Shiladitya Sarkar

> One must from time to time repeat what one believes in
> proclaim what one agrees with and what one condemns
> —GOETHE

To pass comments on a present situation is risky, for it can lead to distortions due to one's biases and the degree in which I pursue my objective may not make everybody happy But it is not intended also

The focus of this essay is Man and his Methods To be precise the man that we intend to scan is the isolated *homosapien* who is now a fragment and not a social man, who, to use Emile Durkheim s phrase is the masterpiece of existence For in society man has become an alienated scapegoat Where cynicism and an overwhelming sense of evil seems to engulf human existence Facing such a situation the response given by political philosophy is marked by a lack of coherent world outlook and though we don t discard, yet we doubt the methods which has been advocated for his salvation If his is our core theme, then the frame in which we develop our analysis is the interconnected notion of *crisis and cognition*, through which we intend to project how crisis shapes cognition and in its reciprocal role how cognition affects crisis

By this line of reasoning we are first led to ask In what way society itself has gone under transition that it in turn has affected both the definition of man and his society The previous idea of man was largely 'Homeric' in the sense that he was not viewed in part, but in all his dimensions, complete with all his actions and aspirations—not one aspect of man picked out of context and exaggerated out of focus, for he was viewed with the total social matrix The concept of his role grew out from his interaction with social institutions The question of his authority and obligation sprang from his attachment with the nation-state and the political institutions , on the other hand, the spiritual and moral context of man—his path for salvation, forms of piety, morality and virtue grew out from his attachment with the other institution—the Church and Religion—for codes of behaviour were stipulated by the Church and was sanctioned by religion—the political philosophy that grew out in this milieu was focussed on man versus state and on the other man versues Church Whatever shortcomings this philosophy may have, one point is clear that it was marked by a constant concern for man and the great issues of politics and society were never refused—for they were always with him, even if they could not always be said to be for him 'Theory exists', Andrew Hacker writes, 'because there have been men of intellect who saw politics as real problems which cried out for solutions' To this demand philosophers ranging from Plato, Aristotle, Bacon, Rousseau, Kant, Hegel, Marx and others responded positively, and sought to come to grips with the practical world, with the significant problems of their age

The picture is different today We have dissatisfied anarchist intellectuals turning into lovely nihilists , we have skeptics who are confused in what they say , we have intellectuals who fancy models which lead to tautology Indeed there is a crisis in the domain of political philosophy and theory We don't demand another Aristotle or Rousseau, for the present crisis needs to be viewed by present thinkers In this respect the picture is bleak Why is this so ? We turn to this theme now

Previous notions about man and society started decaying with the first spark of industrial revolution and the process reached a zenith with the 'enlarged division of labour' and broadening of the market Market became the mother of everything generating evils, contradictions and motivations for specialization and technological cravings The last one (technology) created a different crisis From the womb of the market emerged the grand Leviathan—'The Machine', which on the one hand enlarged the domain of the market, and on the other, created a tremendous impact on man's life At its embroynic stage man himself was the market of the machine But as the functional side of the machine grew in size, the operational domain of man in relation to the machine got reduced He first lost his role in the enlarged market and then in front of the machine This is the first step of alienation But he cannot refuse it, for his desires were fulfilled by it though "he himself became unaware of the way in which the machine" as well as the market "determines the movement of his desires"—(Caudwell) This crisis had two consequences

(1) On the cognitive level this crisis took a different form As the rapid stride of civilization was nurtured by technology, creating in turn a sense of chaos and alienation—man became sceptical about civilization and its validity

(2) Secondly this crisis, in the level of cognition reflected the same categories of society As the operational domain of a man is reduced to a tiny spectrum, the focus for cognition also shrinks —for his life's experience holds him back to transcend the limits "Thus there occurs an increasing specialization and technical efficiency inside the different domains of ideology . leading to an increasing anarchy and contradiction between the domains" (Caudwell)

This exactly is the picture which comes into limelight if we scan the methods and process of modern political philosophy and theory.

THE MODERN METHODOLOGY

There prevails a cynical attitude of indifference to ideas and ideals in the world today and the mood of this scepticism was intensified by such factors as the two World Wars, Great Depression, the rise of fascism Coupled with these factors are the notions of an all powerful state, decaying of moral values and the inner contradiction in political and economic Institutions

Confronting such a situation, the ideas that developed lack any integrated world outlook Philosophers and authors ranging from Hannah Arendt to Albert Camus, from Karl Popper to Herbert Marcuse, from Sartre to Michael Oakeshott and a host of others who keep their fame and stomach in selling ideas in return of which we get the idea of 'an individual' but not the concept of individualism as such—(what a paradox !) , we get the idea to discard reason of every kind (Oakeshott) ; the idea of piecemeal Social Engineering, instead of large scale experiments (Popper) or at best the idea of a lone rebel (Camus)

There is a growing trend in the social science sphere where the great issues of politics and society is left out in favour of a small domain of research characterized by technical jargon and mathematical acrobatics A shallow empiricism goes nowadays under the name of scientific study This indeed is a reflection of the specialization and technical efficiency of the market and the fragmented society which in turn moulds the world outlook of these intellectuals.

Moreover their ideas have invariably a touch of scepticism regarding the future and a profoundly pessimistic fear and dislike of power, together with man's essential helplessness in face of it This also can be traced back to a fragmented society with its atomized individuals

The result is two fold

(1) Either they call us to eschew any kind of political or social activity under the banner of any ideology for they believe ideas as such cannot guide political activity

or

(2) They find modern man's salvation in the twin darlings—'will' and 'choice' But the fact they forget is that 'will and choice is a mental capacity and cannot be defined on a general plane For if you want a market based economy 'choice' itself becomes a competitive affair simply for the reason that what I choose lies in contradiction with your choice

The result of such ideas on a societal level leads to a different situation Giving the individual the right to 'will' and 'choice' it helps in furthering state atrocities, as the blame for the consequence of willing and choice lies not with the state, but on the individual and therefore, it becomes easier to make them accountable for the result it leads to Moreover this style of thinking reduces any other 'spheres of alternatives' to the individual. We have earlier said that the society we are facing is an atomised fragmented society and the notion of 'will and choice' helps in accelerating this cleavage further.

Another myth they focus for is the so called idea of a welfare state This they claim is a transition from a negative to a positive state This idea found its theoretical expression in what is known as the 'liberal-democratic theory'—which seems an established political objective in the west But this idea is as vague as the idea of 'will' and 'choice'. For it has not meant any modification of the basic irrationality or inhumanity of capitalism—rather it has acted as a 'shock-absorber', helping in liquidation of great political controversies and genuine political alternatives Keeping the masses entangled within this myth it has killed his intention to protest.

The idea of a 'Mass-rising' for a different order has also been sublimated by their ill-defined idea of power The idea of power as a hidden demon which men cannot control is largely seen in terms of its misuse, and essentially they locate this power in the dysfunctions of the institutions

This negative attitude to power lies in their outlook of man—who is primarily viewed as an isolated atomistic individual and only secondarily as a member of a social group There individuals need to be shielded from society and its political institutions and hence many of them imbibe this feeling among man to alienate themselves from societal and institutional bonds This is one side of the picture Side by side they have a *laissez-faire* view of government and economy, and it is well known that ideas of laissez-faire is bound to develop oligarchic tendencies in the institutions This trend could have been combated with a positive view of power But then it could lead to a challenge of the system itself So they never raise their voice for a radical democracy at best it remains negative Some spokesman no doubt offers a solution such as this Almond & Verba feel that 'a sense of community over and above political decisions' can act as a safety valve against the threats of politics in a community But what constitutes this community—it is the capitalist community full of cleavage and conflict with its alienation, fear and refusal How can those atomised individuals form a coherent community? They never seem to answer The capitalist society and its culture cannot become the bed-rock to act as a foundation for modern man

The alternative to this situation, it was felt, was Marxism But the sad thing is this that from a method of cognition providing an integrated world outlook Marxist ideology has been transferred into mere political slogans Marxist followers in their present analyses never seem to go beyond the interpretation of their respective government s role and policies (Progress Publishers bear testimony to this fact)

Secondly the greatest failure of the Marxist lies in his inability to provide an alternative need to the people This is the greatest problem which needs to be solved before any programme of action can be voiced We have to remember that the capitalist world has created a deliberate cleavage between human wants and needs—so much so that what is wanted is not needed, and what is needed is not wanted The west has inculcated this false notion among the really depressed whereby they identify the needs of the upper strata to be their's Facing such a situation what is essential is a thorough re-definition of the needs not just harping on political emancipation It is this failure which I personally feel has crippled Marxism in the present milieu .

Moreover, the inner contradiction within the Marxist camp—each claiming to be the sole preserver of Marxist maxims drifted away a wider section of people from communist ideology A crisis has occured even within Marxist cognition. It has become so diffused and hazy that active politicians themselves have become colour blind and confused on 'what is to be done'.

IN LIEU OF A CONCLUSION

"To give up solving problems because they are difficult is a treason to human race' We believe this for we still have a bias—"a bias ', as Barrows Dunham says, "In favour of mankind" If this is our sole objective, it is high time that we stop flirting with utopian ideas and fanciful models

An important question needs to be settled Do we need piecemeal social engineering as Popper says and eschew large scale social experiments ? Carr's comment is apt in this respect "Progress in human affairs has come mainly through the bold readiness of human beings not to confine themselves to seeking piecemeal improvements in the way things are done" We need a total change and for this we need to discard old methods and ideas.

The basic problem that needs to be solved is the older notion of power which advocated more power for the individuals and too little for the rulers Such an idea is bound to be negative for it inculcates little sense of the possibilities of a responsible use of power' Power is often seen to lie on the institutions' and to save the individuals from it what is projected is the notion of a dichotomy between power and freedom. The alternative idea that we need to develop is what Cole said—"there are more kinds of tyranny and oppression than the political and more kinds of freedom than the liberal-democratic freedoms ' This notion of power seen as a threat to freedom has diluted the basic question 'whose power is it' and 'what purpose does it serve' Man needs power to achieve the real purposes that are necessary for him and it alone can give meaning and

content to freedom. And for this what is required is not a negative attitude towards institutions. If you are unhappy with the present state of affairs then what is needed is the right flowering of 'tensions'—not arbitrary tensions but connected with the question of man's emancipation. But a tension can develop only by inter-action—inter-action in a positive manner with the institutions. But in the west we have seen that there is a lurking fear towards institutions which is seen as the sole authority possessing power. And as there is not mass confrontation the system remains without a challenge and goes on perpetrating atrocities.

On the other hand due to the idea of the welfare state, an excessive dependence upon the state has occured. The state has been deliberately projected in this manner so that no radical ideas against it can develop. But in reality that same oppressive state remains. What is needed in this situation is the development of a collective political process against this so called myth of Affluence. In this respect, the Marxist needs a re-alteration of his methods to fight against this idea of so called 'positive state'.

The answer of man's salvation lies only with Marxism—for the simple reason that the situation which gave birth to Marxist cognition still exists today and of course in a much broader dimension. The reaction in the Marxist domain should not mislead us—because if you fall from a tree it is useless to lay the blame on gravitation. But more faith in Marxism will lead us nowhere.

The greatest threat to Marxism in today's world is the 'cultural hegemony' imposed by the capitalist world. As the notion of culture is very volatile, with the help of mass media it has percolated in every starta of society creating a false image of equality and 'equilibrium'. In the west Marxism failed as it fell a prey to the dominant bourgeois ideology. This could be combated by imposing a 'counter-hegemony' keeping it as an alternative to the bourgeois culture. Moreover what is needed is a thorough redefinition of 'needs' articulated by a committed party.

We need this to put an end to the chaos that is so prevalent in the capitalist world. There the economy is an economy of waste and their government is a platform to generate injustice. It is clear that by keeping the masses entangled under the garb of ill-defined concepts it has failed to solve the basic problem of man—his sense of alienation. For this we need an altered state and a different mode of production.

The humanist theme in Marx is very often overlooked. This focus on the causes generating alienation is still relevant today. But in this case we have to remember what he said earlier that basic application of Marxism needs to be altered (mind it, not reformed) to attend the present crisis that is ravaging human society for it is only in Marxism we find the portrait of a fully liberated man with its full essence. This cognition is the only answer we have uptil now to resolve the crisis. The Marxist therefore should be well-aware of the fact that they themselves should not give rise to an 'elite-structure' and thereby start showing the same symptoms of a capitalist organization. If Marxists have failed uptil now in this respect then they have to face the truth as it is, so as not to make the mistake again.

We therefore should not become sceptics and refuse the validity of ideas and ideals. We believe in reason and rationality for we have to quote Barrows Dunham—"A bias in favour of mankind".

Man The Symbol-Monger

Swarajbrata Sengupta

THE MESSAGE IN THE BOTTLE, by WALKER PERCY, *Farrar, Strauss and Giroux* THE PLEASURE OF THE TEXT, by ROLAND BARTHES, *translated* by RICHARD MILLER, *Hill and Wang*

WALKER PERCY's *The Moviegoer* is a classic and compelling account of the power of representation, of re-presentation, and his later novels show the same wry acuteness in describing characters adventures in the intersubjective space of symbolic representation *The Message in the Bottle*, a very intelligent if uneven collection of essays which includes, among others, his famous *"Metaphor as Mistake'*, speaks directly of these matters Man is *'Homo symbolificus* , the "symbol monger", distinguished from other creatures by the fact that he dwells in a world of symbols. "The world is the totality of that which is formulated through symbols'

The book s subtitle, 'How Queer Man Is, How Queer Language Is, and What One Has to Do with the Other, gives both the direction of his argument and the deliberately "unprofessional mode in which readings and insights are marshaled If man is a rational animal, why does he behave so strangely ? No sensible animal so insistently courts self-destruction, insists on being unhappy in good circumstances and happy in bad If man behaves in paradoxical ways it is because he lives in a symbolic order Indeed, our notions of rational behaviour have been produced and elaborated by a behaviourism which works very well for rats in mazes and animals in their ordinary world but which singularly fails to apply to the most complex and interesting aspects of human behaviour Books on learning theory, stimulus-response theory, etc fail to 'show what happens when a child understands that the sound *ball* is the name of a class of round objects, or when I say *The centre is not holding* and you understand me "

On the other hand, when one turns to linguistics for elucidation of this central mystery of the characteristically human, one learns a lot about phonemes, distributional regularities, and syntactic transformations, but next to nothing about "what happens when people talk, when one person names something or says a sentence about something and another person understands him' For Mr Percy the mystery of language is the mystery of the name "Naming is generically different It stands apart from everything else that we know about the universe What happens when a baby suddenly grasps that the word *balloon* is a name, or when Helen Keller who had previously responded to signs behaviouristically to signs as signals—suddenly accedes to the symbolic condition by recognizing the word *water* as the name of the cool wet substance she feels ? What is the nature of this connection, he asks, and placing it at one corner of a triangle whose other points are word and object, he calls it "the Delta phenomenon', a phenomenon that lies at the heart of every linguistic and symbolic event By the end of the book it is still a mystery, though it is now treated as a "coupler' which relates the visual cortex to the auditory cortex

The problem of the sign has a history of which Mr Percy is partially aware, but the most interesting and contemporary moments of that history suggest that his problem is insoluble in the form proposed What he seeks is a moment of unity, a point of origin where form and meaning are fused , but since the sign is always a *sign of*, however far one tries to push toward a pure and unitary origin one will always find a dual structure The problem may be insoluble, but that it should at least be posed in another way emerges if one notes that it is nonsense to ask what was the first sign or word a baby used It is contrast between signs that allows signs to emerge, so that the individual sign or name is not the unit in whose terms the problem should be posed Signs are produced by differentiation of undifferentiated noise and differentiation of an affective universe Differences are what constitute signs, and thus the problem is one of difference adn repitition

Percy offers a forceful if unnecessarily repetitive critique of behaviourism, but he is not always aware of the implications of his own insights and formulations, and this can lead to a measure of confusion. Thus, the central fact on which he insists is that man lives in a symbolic universe, and that therefore his experience is mediated by symbolic structures and systems of names The varieties of symbolic mediation are what explain man s paradoxical behaviour , the bored commuter on his evening train becomes less bored by reading a book about bored commuters sitting on trains And Mr Percy's superb discussion of the "dialectic sightseeing (the way in which symbolic representations or frameworks alter the character of perception) is based on his awareness of mediation It is impossible to see the Grand Canyon in its full nakedness, though

one can get off the beaten track and come upon it unawares, or encounter it in other contexts which give it a different force, or finally, for real sophisticates who have exhausted the variety of oblique approaches, the thing may be recovered from familiarity by an exercise in familiarity , one joins a tour party, stands behind one's fellow tourists, and sees the Canyon through them, their picture-taking, and their predicament The impossibility of direct, unmediated experience is the basis of this dialictic

Yet at the same time, direct perception is something Mr Percy longs for, and not merely with that nostalgia for what is irrecoverable His remarks on the inadequacy of behaviourism and linguistics are ascribed to a Martian, the hypothetical representative of unmediated vision, and Mr Percy seems to conceive of his own role in the same way , since I am not a professional scientist/linguist/philosopher/critic, he will tell us, since I am free of these symbolic frame-works, I can, like a Martian, see things in their true nakedness He goes on to suggest that an inhabitant of Brave New World who comes upon Shakespeare s poems 'is in a fairer way of getting at a sonnet' than a student who reads it in a literature course, and he extends this to a general educational principle 'I am serious in declaring that a Sarah Lawrence English major who began poking about in a dogfish with a bobby pin would learn more in thirty minutes than a biology major in a whole semester". When he goes on to declare that "it is nevertheless a fact that the zoology laboratory at Sarah Lawrence College is one of the few places in the world where it is all but impossible to see a dogfish, 'one suspects that "see" has taken on a special meaning and that in his enthusiasm for direct, unmediated perception he has forgotten that outside of symbolic systems the dogfish would be nothing but a lump of undifferentiated matter and certainly unknowable

In brief, Mr Percy raises a series of problems which are central to contemporary thinking about signs, representations and symbolic systems, and though he often does so without full awareness of their implications or of the distinctions which others have raised his clear presentation and his skill in relating them to little dramas of ordinary experience make this a book to recommend

Roland Barthes's *The Pleasure of the Text* also treats man the symbol-monger, though in a different mode, sophisticated and elusive, with no appeals to impossible origins or to unmediated perception It is a book which has given and will continue to give pleasure to readers of various persuasions For Barthes s many admirers, it is a very Barthesian book a series of discontinuous and unconventional mediations, full of that speculative and linguistic inventiveness which makes Barthes one of the great masters of French prose For the skeptics, for Barthes's detractors, *The Pleasure of the Text* gives pleasure because it seems a give away from behind the mask of the systematic theorist or semiotician there emerges a fallible idiosyncratic Barthes, who confesses that he reads selectively, with variable rhythms, seeking pleasure where he can find it *The pleasure of the Text*, Barthes's pleasure of the text, reveals an impressionistic reader and thus deflates the theoretical claims of his earlier projects.

Such conclusions are mistaken or, more precisely, stupid , for what is stupidity but the delusion of superiority in one who fails to discern that he has been trapped, led inexorably, step by step to his judgement, by that which he pretends to judge? Barthes gives nothing away, no confession could be more discreet His impregnable defenses are perhaps clearest in the strategy of presentation The alphabetical table of *contents* suggests that he produced meditations on a series of topics and then ordered them in this way, in a sequence which is the very image of the arbitrary But, on the other hand, the topic headings are so contingently, so tenuously, connected to the meditations that they are not even printed in the text itself, and it is perfectly conceivable that he produced an ordered series of meditations and then invented a title for each one , a title which was determined primarily by the convention of alphabetical order The reader cannot outplay Barthes or determine where he stands

More important however, the book is theoretical speculation, despite its fragmentary nature and ostensible subjects Pleasure here is not a spontaneous affirmation or the affirmation of spontaneity, not a move 'beyond theory to direct experience, it is a theoretical object

It is not a consistent or sustained object, to be sure, it floats. Sometimes it is the undifferentiated *telos* of reading , the generalized object of the reading quest which determines textual strategies At other times pleasure is opposed to *jouissance* (which Richard Miller unfortunately renders as 'bliss) The text of pleasure which in *S/Z* was called "readable', is linked to a comfortable practice of reading . it is the text which we know how to read, which complies with the conventions and expectations of reading The text of bliss,

or rather ecstasy, is that which we do not know how to read: "Text of bliss, the text that imposes a state of loss, the text that discomforts (perhaps to the point of a certain boredom), unsettles the reader's historical, cultural psychological assumptions, the consistency of his tastes, values, memories, brings toa crisis his relation with language". The book explores the relations (historical, psychological, typological) between these two types of text or textual forces and asserts the importance of interpenetration. Pure *jouissance* or unreadability is of no interest ; *jouissance* is a matter of erotic gaps, discontinuities, fadings, indeterminacies, and it can imply, as Barthes says, a certain boredom, (There is no sincere boredom, he says, boredom is ecstasy seen from the shores of pleasure ecstasy approached, that is to say, in the other frame of mind)

This reflection on boredom nicely illustrates what Barthes is doing. We think of boredom as an immediate affective experience, but it is obviously a theoretical category of the first importance ; a category which should play an important role in any theory of reading. If one reads intently every word of a Zola novel, one becomes bored, as one does if one tries to skim through *Finnegans Wake*. This tells us something about texts and the strategies of reading they require. And so discussions of boredom, though they may seem to partake of a confessional mode, are fragments of a theory. And if *The pleasure of the Text* does not take itself seriously as theory, if it self-consciously eschews a continuous mode, that does not mean that we should not take it seriously as the traces of a project which we can continue.

An Ode

Sibani Sengupta

As he lay on the bed thinking, when will I get well ?
The thought of his untimely exit from this world's stage
Made him shiver.
Yet he was always smiling,
Talking and joking with friends and relatives.

What a gallant warrior was he
For days and months he battled against the deadly disease,
With not even a single twitch of his face.
No qualms or grudges against Destiny.
Just a firm and strong belief.
"That I'll get over this soon,
And once again tread on the green grass
Under the blue sky all by myself".

The green grass dried in winter,
The blue sky became overcast with dark clouds,
A tempest ensued and blew out the flickering flame of his life.
And as we bade him farewell amidst floral wreaths
Heaven threw open its gates for his arrival.
The following night as I sat gazing at the sky.
The twinkling stars seemed to say,
"Don't worry, he is fine here".

(This poem has been written in fond memory of Arijit Sengupta a B.A., 3rd year History (Hons.) student of our Presidency College who passed away on 20th January this year.)

Mathematics of Historical Materialism

Santanu Mitra

STRANGE BEDFELLOWS

Mathematics and Historical Materialism · a combination such as this is not as strange as it seems to be Contrary to popular belief, mathematics is so flexible that it can accomodate complex social sciences though it has miles to go in that direction Moreover, all the complexities of the social sciences should be simplified at first and then developed gradually for the better understanding of themselves—history of the advancement of knowledge supports my contention

Mathematics is only a language but the most economic of all of them It is pure and simple logic and all spheres of life embrace logic as their main support Here I attempt an analysis of a few basic results of Historical Materialism (HM) on the basis of mathematics because I believe in the maxim that everything which can be proved with the help of mathematics is by far nearer to truth than anything which can t be proved by that logic

THE SUBJECT MATTER OF HM

It is the study of society and the laws of its development based on DM (Dialectical Materialism) These laws are as objective, i e independent of man's consciousness as the laws of nature's development Like the laws of nature, they are knowable and are applied by man in his practical activity The essential distinction between them is that the laws of nature reflect the operation of blind, spontaneous forces, while the laws of social development are always manifested through people acting as intelligent beings who set themselves definite aims and work to achieve them

In contrast to the concrete social sciences HM studies the most general laws of social development HM enables us to understand what role the people and individuals play in history, how classes and the class struggle arose, how the state appeared, why social revolutions occur and what their significance is in the historical process, and a number of other general problems of social development

THE DESTINATION

Now, because of my limitations in the field of knowledge of mathematics I have not succeeded till now to prove each and every law with the help of mathematics May be, in the existing state of mathematics that is still impossible So I shall have to resort to the traditional method in social sciences which assumes some laws to hold true as axioms (based on the lessons from history) and, on the basis of that, prove some other law

Class struggle occupies a central role in HM A comprehensive definition of classes was given by Lenin in his work 'A Great Beginning 'Classes", he wrote, "are large groups of people differing from each other by the place they occupy in a historically determined system of social production, by their relation (in most cases fixed and formulated in law) to the means of production, by their role in the social organisation of the share of social wealth which they dispose of and the mode of acquiring it" The relation of a class to the means of production is its chief feature determining its place and role in social production, and also the way it obtains its income and the size of that income The division of society into classes is not eternal In primitive society, there were no classes Production was at such a low level that it yielded only means of subsistence, barely enough to keep the people away from starvation There was no possibility of accumulating material wealth for the birth of private property, classes and exploitation Subsequently, however, as the productive forces developed and labour productivity increased, people began to produce more than they consumed It became possible to accumulate material wealth and appropriate means of production Private property appeared, as a result of the increasing division of labour and growth of trade The development of private property in the place of communal property increased the people's economic inequality Some men mainly the tribal nobility, became rich and seized the communal means of production Others, deprived of the means of production, were compelled to work for those who became their owners This was how the

disintegration and the class stratification of the primitive community took place This process was consummated in the birth of opposing classes and exploitation The antithetical position of classes in society was the source of their bitter struggle This struggle, according to Marxism, is irreconcilable because of the basic differences in their economic and political status in the society The history of antagonistic class societies is the history of the class struggle ' Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary reconstitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes," wrote Marx and Engels in the 'Manifesto of the Communist Party'.

A class society has basic and non basic classes The basic classes are those connected with the mode of production prevailing in the society In an antagonistic class society, they are, on one hand, the class owning the means of production and, on the other, the oppressed class standing in opposition to it Antagonistic societies also have non-basic classes which are not directly connected with the prevailing mode of production (free artisans in slave-owning society, peasants in capitalist society and others), and also various social groups (the intelligentsia, clergy and others).

The class-struggle in an antagonistic society takes place above all between the basic social classes The non-basic classes and social groups usually have no line of their own in this struggle , they vacillate and, in the long run, side with one of the basic antagonistic classes and defend its interests The class-struggle is a mighty driving force, the source of development of an antagonistic class society This determines the development of an antagonistic society both in relatively 'peaceful' periods and, particularly, in periods of revolutionary storms and upheavals Without the class struggle there would be no social progress Society s progressive development is usually faster, the more stubborn and organised the struggle is The social revolution, the highest form of the class struggle, plays a particularly great role in social progress and results in the destruction of the old and the establishment of a new, more progressive social system

Again, in contrast with bourgeois ideologists, Marxism has demonstrated that the state is not something introduced into society from the outside, but is a product of society's internal development The state was brought into being by changes in material production The succession of one mode of production by another causes a change in the state system The state was brought into being to protect private property, the rule and security of its owners According to Marxism, it arose with the appearance of classes and it will vanish, wither away, with the disappearance of classes

The main feature of a state is the existence of a public (social) authority representing the interests of the economically dominating class and not of the entire population This authority rests on the armed forces States differ according to the class they serve and the economic basis on which they arose Each type of state has its intrinsic form of government The form of government depends on the concrete historical conditions of each country, on the balance of the class forces and external conditions However diverse the forms of government, however much they may change, the type of state, its class nature, remains unaltered within the framework of the given economic system And with society s development the types and forms of the state change—and this is what I want to attain as a mathematical proof of the model incorporating the basic laws of HM as assumptions

ASSUMPTIONS, ETC.

My statement of 'The Destination contains the basic principles of HM before stating what I want to attain All these are assumptions (derived from the materialistic explanation of history) in my model But here I propose one or two modifications. Marxism says that every system contains the germs of its destruction in its womb These germs use a particular class as their medium and that class is destined to mould the new system after the said destruction But this, in my opinion, happens in two stages, as we see the process historically Before the description of those two stages, let us clarify another point

Generally a particular state tries to encourage the division of its people in non-basic classes in ways peculiar of it This is so because if the basic classes start gathering force, a fierce fighting ensues and the existing order faces serious challenges to the detriment of the ruling class which the state serves Again, a

particular state, in its initial stages, tries to appease the class or classes which helped the ruling class to attain the power This measure which percolates to a large number of people keeps people happy for the time being because of the illusion they offer Moreover there is the psychological advantage of the relative development over the previous state and the fact that only with the passage of time the truth concerning the nature of the ruling class and its relation to other classes becomes clear In fact, people have an inherent tendency to be involved in non-basic issues when they see that their fight has succeeded in bringing about a change And, so, at least in the initial stages of a state, i e , in the 'peaceful' periods of a state, basic classes are not in a fine shape, non-basic classes dominate and basic classes have a tendency to merge in the non-basic classes and non-basic as well as basic classes fight over non-basic issues created artificially But this stage cannot exist forever, however crafty the existing ruling class may be So, after a certain critical stage is attained by the class which carries the germs of the destruction of the state, it becomes aware of the potential energy hidden in it and in the light of the crisis of the state it examines the basic issues In fact, this is the first stage and in the stage the germs also just take shape and the group of people who foresee their emancipation in these germs comes closer to them and becomes more and more united This realignment makes the leaders of the non basic classes startled and they are, in fact, compelled to turn their eyes to the basic problems to save themselves from extinction In this stage they assist the state secretly to destroy the progressive forces in their own interest If the progressive forces (the word 'progressive is used here in a positive sense—it means 'that which is fathered by the state itself and works for its destruction' and not any sort of value judgement) are not strong enough to survive this onslaught, the old order gains a new lease of life But if these forces are so strong as to survive this onslaught they win the first round of the battle and the reorganisation of the people in basic classes begins—this process is led by people of higher capabilities, a role which such people have played time and often in the course of history and which Marx also recognised for them But here we are to remember that the progressive forces have not taken, till now, the shape of a well-defined class These forces are gaining ground, but only to the extent of influencing the people for the realignment mentioned above Now, in the end of the process the stage is set for the emergence of a brand new class bearing the germs of the destruction of the previous order as the force determining the new order This is more so because with the passage of time the policy of appeasement attains a saturation point where the state thinks that it is a drain in its resources that would otherwise have gone to the ruling class and the state becomes, more and more, an apparatus of exploitation as the ruling class gains more and more confidence

The first stage ends with the growing tendency of the people to turn their eyes to the basic issues Here is the real difference between the first and the second stages In the first stage the basic classes have an inherent tendency to merge with the non-basic classes and to fight over non-basic issues but in the second stage, the tendency is towards the merging of non-basic classes with the basic classes and towards the fighting over basic issues But still, in the second stage also, the basic classes do not take the final shape in the initial period—only the non-basic classes disintegrate and the process of formation of the basic classes is expediated.

This second stage sees growing and seething discontent among the populace and the state trying frantically to curb this by the use of all possible repressive measures Efforts are made to solve the problem in the framework of the existing order perpetuating the oppression, even by conceding some demand of the the oppressed classes But then, there is a limit to this process also People with above normal capabilities adorn both sides of the fence and they sharpen the edge of the contradiction between the two After a certain critical point the basic classes come up with definite aims of capturing or retaining the power, or of helping another class in the process. The new progressive class emerges suddenly as a force to reckon with (qualitative change from quantitative change). Now we have reached the doorway to our destination

MATHEMATICAL FORMULATION

In any mathematical formulation we should look for the quantification of different aspects, if possible This may be done in a number of ways We would adopt one which will help us in the ultimate analysis We will assume that a class possesses power in relation to a particular issue according to or directly proportional to the active people in that class at least in the long run This assumption may seem to be too rigid—but, in the long run, as history shows, the more the strength of a class in this sense, the more the class gains a share in any decision making process regarding the matters of the concerned state and we can formalise this truth in the realm of mathematics only at the cost of a little bit of flexibility Hence Ec_{ji} (the power of the j-th class in the i-th issue) $\propto nc_{ji}$ where nc_{ji}=the no of active people in the j-th class with regard to the i-th issue.

83109

$\therefore Ec_{ji} = K\, nc_{ji}$ where K is a constant of proportionality. We may choose the unit of Ec_{ji} in such a manner as to have $K = \frac{1}{N}$ where N is the total number of people. Here, as is clear, we assume that all members of a class take a single stand on a particular issue—at least this is the case in the long run with the classes, as we learn from history. Hence $0 \leq Ec_{ji} \leq 1$ and this normalisation is necessary for proving one or two facts. Here 'active people' means those people who fight for the issues confronting their class. Now, let there be K non-basic classes in the first stage and let there be an issue (non-basic). This issue influences all the classes more or less and exact corresponding actions from them. Every non-basic class will try to gain as far as possible in terms of this issue. The ruling class will use the state to influence various classes in the decision making process. Now, the course of history teaches us that, *in the long run*, the issue will be solved more or less in a manner of compromise among all the classes, the compromise being favourable to each class according to its strength. If that is not so, *long run equilibrium* won't be reached and the stronger classes will again fight for their proper shares in the compromise. Here I introduce a development region of the society over a certain issue. This development region has nothing to do with the society's development in the sense we use the term. This region indicates the various assortments arising from real life bargaining process, dilatory tactics etc. of class forces over a certain issue over time. And, obviously, this region is a disiquilibrium region. Let there be computed values of Ec_{ji} at period 1 and it will be a point in the k-dimensional Euclidean space (R^k). But, normally, this point does not represent the true proportion of forces because the govt., or for that matter state, tries to influence various classes in their decision and they try to keep away as much people as possible from the group of active persons. So this point cannot satisfy the people in the long run. They become aware of the bluff and in time two more of them are in the process of fighting—possibly again a distorted compromise structure is attained and thus the process goes on till the long run equilibrium is attained. Here we have assumed a learning process—a characteristic of true dynamic states. The long run equilibrium will be somewhere along the diagonal of the k-dimensional analogue of the rectangle whose sides show n_i $\left(\text{where } n_i = \frac{\text{the no. of people in the i-th class}}{\text{the no. of people in the society}}\right)$ because, in the long run, all people struggle for an issue, directly or indirectly. Why this diagonal ? Because, mechanics says so in its Parallelogram Law of Addition of Forces and if someone objects to the use of mechanics here, I'll make him remember that, at least in the case of a rectangle, any point on the diagonal shows such a proportional assortment as is required by our assumption.

Now we introduce the govt's advantage function. The govt. advantage function assigns ranks to points in this k-dimensional space in accordance with the govt's view of the assortments of forces in the light of the interests of the class it serves. So it is a function of Ec_{ji}'s but has ordinal significance only. We assume it to be continuous. The structure of this function depends upon the nature of the state. Now, in the development region, the govt. will try to reach that point where it would gain maximum advantage. But if that point is not on the diagonal mentioned above, that assortment of forces won't be stable even in the existing order. But, if that point is on that diagonal, and if not disturbed further, that assortment of forces would be stable and final in the existing order because the compromise structure that is represented by that assortment of forces will take due recognition of the proportional strength of classes. Equilibrium will be attained whenever the disequilibrium region touches or crosses that diagonal but, for stability, both conditons should be met.

We may conclude the mathematical formulation of the first stage by uttering a warning that the equilibrium is to be attained *only in the long run* and before that is attained, external forces may change the whole thing in such a fashion that the whole issue may be obsolete and the long run equilibrium over that particular issue will never be attained.

Now we come to the second stage. The analysis here is a bit complex. Here the classes will be of a basic character in general, barring a very short initial period. But for the large part of this stage we shall be able to recognise the old basic classes only (of the previous form of state), the new class originating from this state itself will be in a very rudimentary form and it won't be a force worthy of recognition before long. This class will cling to one or two old basic classes and make them allies for its survival. Its struggle will be taken up by those allies, at least to that extent which won't jeopardise their own interests. But then, suddenly, after a period of gradual increase in strength, a critical point comes where this class adds a new dimension and becomes a force to reckon with in the power structure. This class, as it carries the germs of the destruction of the existing system, opposes the existing system tooth and nail and captures the power. Some may argue

that the emergence of this class, by itself, doesn't ensure that they capture the power The existing state curbs them But as soon as a class opposing the existing system becomes a force to reckon with, it passes that critical stage where it can be curbed effectively, by assumption and, now it will grow further and further so long as this old state exists. So, it's only a matter of time that they capture power Now, if there were n basic classes in the existing state, now it would be (n+1) basic classes and be the new class in power or not, the qualitative characteristics of the development regions will change which will reflect a change in the nature of the state Moreover, by assumption, the new class will capture power and the form of the advantage function will also change Now the reference frame containing the development region is an (n 1) dimensional space The sudden recognition of this force, as mentioned earlier, seems very natural when we think of the law of the passage of quantitative into qualitative changes of DM In the process of development, Marx wrote, merely quantitative differences beyond a certain point pass into qualitative changes " Here the change in the nature of the state has two distinct periods—1) the period of transition from the time of sudden recognition of the new class as a force till the time of its capturing of power—this period is very short in most of the cases and 2) the next period when the structure of the govt advantage function changes Of course, the second is a natural consequence of the first In fact, the change in the nature of the state encompasses the change in the people's reactions to a particular issue and that in the govt s behaviour But, under Marxist assumptions, the second only takes cue from the first There is no mechanism to ensure the second in the absence of the first But the first period begins *suddenly* when the new class comes up as a force to reckon with And this is what is meant when we say that the nature of the state changes suddenly because people s reaction is the primary determinant of the nature of a state This process of change ends with the new class capturing the power If we don't see the process of change in this fashion, our article will be only an academic exercise in futility

The qualitative characteristics (mentioned below) of the development region reflect the nature of the people s reaction on a particular topic

MATHEMATICAL PROOF

Now I shall take refuge in the brilliant edifice of Topology which is non-quantitative geometry It deals with connectedness of points, inbetweenness of points and such other qualitative characteristics

The complexity of social phenomena is very efficiently looked into by this qualitative geometry

Now we define 'homeomorphism' A mapping f $X \to Y$ of metric spaces is called a homeomorphism and the space X, Y homeomorphic if (1) f is bijective, (2) f is continuous, and (3) the inverse mapping f^{-1} is continuous

A mapping of sets f $X \to Y$ of metric spaces is said to be bijective if *each element from Y is the image* of a certain element from X and if different elements from X are mapped into different elements from Y Again a set X alongwith the mapping p $X \times X \to R^1$ (into the number axis), associating each pair $(x, y) \in X \times X$ with a real number p (x, y) and satisfying the following properties, is called a metric space , properties (i) $p(x\ y) \geq 0$ for any x, y (ii) p (x, y) $=0$ if and only if $x=y$ (iii) p (x, y) $=$ p (y, x) and (iv) p (x, y) $\leq p(x, z)$ (z x) for any x, y, z $\in R^3$ (the triangle inquality)

Now we come to the theorems which will bear the onus of the proof

Theorem 1 The disc D^m is homeomorphic to the space R^m, $m \geq 1$

Consider some subsets of R^n, $n \geq 2$ Let S^{n-1} be a sphere, and D^{n-1} an open n-disc with unit radius and centre at the point (0, ,0) Denote the part of the sphere where $\xi_n < 0$ (i e , the northern hemisphere) by S_+^{n-1} At first we prove that the disc D^{n-1} is homeomorphic to S_+^{n-1}

The space R^{n-1} may be considered to be coincident with the subspace of points $(\xi_1$, $\xi_{n-1}, 0)$ of the space R^n if the points $(\xi_1,$, $\xi_{n-1})$ and $(\xi_1,$, $\xi_{n-1}, 0)$ *are identified* Then D^{n-1} and S_+^{n-1} lie in R^n and are given thus :

$$S^{n-1} = \{(\xi_1, \ldots, \xi_n) : \Sigma_{i=1}^{n} \xi_i^2 = 1,\ \xi_n > 0\}$$
$$D^{n-1} = \{(\xi_1, \ldots, \xi_n) : \Sigma_{i=1}^{n-1} \xi_i^2 < 1,\ \xi_n = 0\}$$

The projection f : $(\xi_1, \ldots, \xi_{n-1}, \xi_n) \rightarrow (\xi_1, \ldots, \xi_{n-1}, 0)$ determines a continuous bijective mapping of S_+^{n-1} into D^{n-1} in R^n Consider the inverse mapping. It is of the form $f^{-1} : (\xi_1, \xi_{n-1}, 0) \rightarrow (\xi_1, \ldots, \xi_{n-1}, (1 - \Sigma^{n-1}_{i=1}\xi_i^2)^{1/2}$ and continuous. Hence D^{n-1} and S_+^{n-1} are homeomorphic.

Now we establish the homeomorphism of D^{-m} and R^m, $m \geq 1$.

Putting $m = n-1$, we use the previous construction. We translate the space R^{n-1}, $n \geq 2$, so that the origin of co-ordinates goes to the point (0, 0, ..., 0, 1), the north pole of the sphere S^{n-1}. Every point in the new plane has the form $(\xi_1, .., \xi_{n-1}, 1)$. If we draw the half-line $n_i = t\,\xi_i$, $i = 1, .., n$, $t \geq 0$ through each point $x = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in S^{n-1}$, it will intersect the constructed plane at a unique point corresponding to the value $t(x) = 1/\xi_n$. By assigning this intersection point to the point x, we obtain the mapping $\Phi : S^{n-1} \rightarrow R^{n-1}$ given by the rule $(\xi_1, \ldots, \xi_n) \rightarrow (\xi_1/\xi_n, \ldots, \xi_{n-1}/\xi_n, 1)$. This mapping, as it is easy to verify, is a homeomorphism. The superposition of the homeomorphisms $\Phi\, f^{n-1} : D^{n-1} \rightarrow R^{n-1}$, $n \geq 2$ yields the required homeomorphism.

Theorem 2. If $m \neq n$, the spaces R^m and R^n are not homeomorphic. [The proof of this theorem is beyond the scope of this article].

The obvious conclusion is that discs of different dimensions are not homeomorphic to each other, as this relation is transitive. Here we are to mention that homeomorphism keeps the topological properties of figures (undergoing homeomorphism) invariant and if two figures are not homeomorphic, there is no mapping which can guarantee the preservation of qualitative characteristics of one figure in another.

Theorem 3. (EXISTENCE THEOREM by Weierstrass) : An optimisation problem always has a solution if :

(i) the objective function is continuous ; and the feasible set is,
(ii) non-empty,
(iii) closed and
(iv) bounded.

Now the task before us is to translate these mathematical statements into the realm of HM. Theorem 3 ensures that the govt. advantage function has a maximum value over the development region ; here our normalisation helps us a lot.

When a new class comes into reckoning, our reference frame becomes (n+1) dimensional Euclidean space from n-dimensional Euclidean space. Again, our development regions consist of one or more discs in the relevant reference frames. Here also our normalisation process helps us. Hence, from the first two theorems we can assert that there is no time transformation function which can map one disequilibrium development region into another and at the same time guarantee the preservation of topological properties of one figure in the other. One example may clarify the matter. Connectedness of points of a figure is one of its topological properties. Clearly, if, over a particular issue, two states have differences in their development regions regarding the property of connectedness, that means differences in the reaction patterns of the concerned peoples. And there is no time transformation function which can guarantee the preservation of this property. So, one state cannot be expected to behave in the same qualitative fashion as the other when the reaction patterns of the peoples concerned are qualitatively different—hence the nature of state changes. In other words, one state won't be transformed into another within the framework of the existing process and the change is sudden and once for all. Revolution brings about the end of this process of change by transfering power to the new class inimical to the old system. And this capturing of power is only a matter of time and, under certain assumptions regarding the behaviour of political systems, this will follow from the model formulated above. Here I won't go into that detail—only the statements made above suffice to say that we have reached our destination because the revolution will cause the govt. adjustment function to change in favour of the new class and its allies.

The point to be noted is that there is no logical necessity to prove the last assertion to reach our destination. Nature of a state is primarily determined by the people's behaviour and then, only secondarily, by the govt's behaviours and the second follows largely from the first, depending to some extent on local

variations. Hence we have finished our task at the point when we have proved that peoples' reaction patterns become different after a critical point of time when the new class becomes a force to reckon with.

HISTORY REPEATS ITSELF ?

This popular belief and our destination—these two are, apparently, standing apart. But, so far, statements concerning history have not been made with scientific precision and hence the arising confusion. History really *sometimes* repeats itself, but *only in the states of same dimensions over time or in dif.erent regions.* Here 'states' has been used in a less rigid manner and it means simply 'countries' or 'world as a whole' (over time or in different regions, as the case may be).

Without going into the full proof of this I shall state only the theorem that would do the job after some modifications in our formulation. This is Brouwer's Fixed Point Theorem. Any continuous mapping $f : D^{n+1} \to D^{n+1}$ of an $(n+1)$ dimensional closed ball (disc) into itself possesses at least one fixed point, i e., there exists a point $x_* \in D^{n+1}$ such that $f(x_*) = x_*$.

We shall have to take x_* as a particular situation in a given state under a given issue and proceed. Here also the normalisation process helps us a lot.

IN LIEU OF CONCLUSION

I have tried to prove the validity of a law when certain assumptions are true. Whether these assumptions are really true or not—that is an altogether different matter. Some of the assumptions underlying the analysis can be proved mathematically and the method of induction is very important in this regard.

I have faced serious difficulty in translating the topological properties of figures in terms of the reaction patterns of people. This is a sector where I need the readers' help. If there is any mistake in the mathematical part of this article, I'll be glad to know it.

Some mistakes, lack of clarity—etc. are bound to creep in an article by a novice like me. Here I thank Purnendu Kishore Bannerjee of Statistics Hons. 3rd year for some of his valuable comments.

The extent of quantification is not more than that required for achieving the qualitative results and quantifications are compatible with the assumptions of Marxism.

BIBLIOGRAPHY

Marxist Philosophy—V. G. Afanasyev.
State and Revolution—V. I. Lenin.
Historical Materialism—Maurice Cornforth.
Introduction to Topology—Y. Borisovich, N. Bliznyakov, Y. Israilevich, T. Fomenko.

Comments on Marx's Theory of Alienation

Baijayanta Chakrabarti

"Birth and copulation and death
That's all, that's all, that's all."—*T. S. Eliot*

The problems of alienation have become 'free goods' for discus sions and it is clear that interest in these violates 'the law of diminishing returns'. Renowned stalwarts are writing papers, delivering lecutes on this theory in seminars and symposiums. It is adding to the glory of their intellect. There is also a large section of students debating thisi ssue among themselves over cups of tea. But a simple fact still remains : these problems are not for mental and intellectual acrobatics or polemics but require methodical understanding in the face of some growing misconceptions and sometimes wilful distortions.

Now some hints are being presented to help the reader to capture the mode of this article. Sometimes problems of alienation, come out to be wholly dependent upon the psychological framework of individuals. When one falls in love, one may feel alienated from others as he or she does not like to communicate verbally with others and disturb the intensified set-up of the mind. Again some students from Bengali Medium schools may have a sense of alienation among a higher percentage of Anglicised people. But the first one is totally romantic and the second arises out of the conflicts of diametrically opposite cultures. These two trends of alienation are found frequently among the students of Presidency College. But here such sweet problems of cardiac troubles or contrast in cultural backgrounds of students are not going to be discussed. The problem of alienation will be tackled from the viewpoint of Marxian ideology which involves the scientific analysis of the economic structure of capitalist society as a whole. The importance of treating the problem in a wider dimension rather than having concern with individuals only, is clearly explained by Marx himself : "To know what is useful for a dog, we must study dog nature." —Capital (Kerr. ed.) Vol. I, p. 668.

There is an alarming phenomenon of transformation of this term 'alienation' into just a catch phrase. But this is a human experience which signifies distress, confusion and bewilderment of modern men and should not be used so vaguely and loosely. Sometimes it is regarded as aligned with religion, sometimes it is a philosophical concept found first in Hegel and Kierkegaard, then in Heidegger and as a central theme of existentialism. This sense of confusion of spirit, of being left rudderless on tempestuous seas was depicted in Beckett's 'Waiting for Godot', in Camus' 'Outsider' and in many other art forms with great mastery. Marx was indebted a lot to Hegel for his theory but there is a gulf of difference between old Hegelian philosophy and modern Marxian ideology. Hegel considered every objectification of nature as a source of alienation. He put a great emphasis on the need of rising to a higher level of our conscience where true unity between creator and created objects should be found to uproot alienation. Afterwards Feuerbach explained the problem in this way : people projected the best of human nature upon their conception of the diety, thus stripping themselves of their humanity. This is a reverse of the Hegelian explanation but still a flavour of the transcendental always shadows the true nature of the problem. But Marx first realised the problem as an economic phenomenon. Here a point to note is that Hegel suggested that it was the product of man's labour that alienated him. For Marx, alienation is not a religious phenomenon and secondly it is a removable evil. Removing this evil is necessitated with the growing number of 'hollow men'.

Marx summed up his general stand on the question of alienation in the following words : ".... as long as a cleavage exists between the particular and the common interest, as long therefore as activity is not voluntarily, but naturally divided, man's own act becomes an alien power opposed to him. The primitive man, on the other hand, free of such cleavages, feels in his world as much at home as a fish in water." Thus in our attempt to find the root of alienation, we have to probe into the placement of man in a given system during a given period of time. It is the concrete conditions of socio-economic life that cause alienation. Alienation, in other words, is not purely a subjective thing, nor can be regarded as an objective entity, rather as a complex process in which both subjectivity and objectivity are interlocked. Marx's concept of alienation has four more aspects which are as following :

(a) man is alienated from nature
(b) he is isolated from himself (from his own activity)

(c) from his species-being (from his being as a member of the human species)
(d) man is alienated from man (from other men)

The first characteristic of 'alienated labour' expresses the relation of the worker to the product of his labour, which is, according to Marx, his relation to the 'sensuous external world , to the objects of nature The second, on the other hand, is the expression of labour's relation to the act of production within the production process, that is to say, the worker s relation to his own activity as alien activity which does not offer satisfaction to him, in and by itself, but only by the act of selling it to someone else Alienated labour however turns, man s species being, both nature and his spiritual species property, into a being alien to him, into a means to his individual existence It estranges man s own body from him, as it does external nature and his spiritual existence, his human being (Marx, Economic & Philosophic Manuscript of 1844) Marx also called the first characteristic 'estrangement of the thing Whereas the second he called 'self-estrangement The third aspect is related to the concept according to which the object of labour is the objectification of human life , for man "duplicates himself not only as in consciousness, intellectually, but also actively in reality and therefore he contemplates himself in a world that he has created " The third characteristic is implied in the first two being an expression of them in terms of human relations, and so is the fourth characteristic mentioned above But whereas in formulating the third characteristic, Marx took into account the effects of alienation of labour both as "estrangement of thing' and 'self-estrangement'—with respect to the relation of man to mankind in general (i e the alienation of humanness in the course of its debasement through capitalist process), in the fourth he is considering them as regards man's relationship to other man As Marx put it "An immediate consequence of the fact that man is estranged from the product of his labour, from his life-activity, from his species being is the estrangement of man from man If a man is confronted by himself, he is confronted by other man What applies to man's relation to his work, to the product of his labour and to himself, also holds of man's relation to the other man and to the other man's labour and object of labour' Thus Marx's concept of alienation embraces the manifestations of "man's estrangement from nature and from himself', on the one hand and the expression of the process in the relationship of man-mankind and man-man on the other

On the top of all there is a complicated economic process, particularly under capitalism, that has made an ever increasing use of division of labour But in the process labour is treated just as a commodity From the viewpoint of economics, when a manufactured object becomes a mere commodity for sale, there occurs a separation of its usevalue from exchange value Consequently we all become no more than buyers and sellers Exchange value money becomes the motivation of living and the moulding force of lives Thus living life with an acquisitive spirit becomes axiomatic, and a frantic process of fulfilling the aim of possession for oneself begins which has no end The competitive laws of capitalism are implying that human needs can only be gratified to the extent to which they contribute to accumulation of wealth As a result of the free forces of demand and supply, the worker s human qualities count only in so far they exist for capital alien to him Thus labour and any other non-living commodity becomes synonymous in a capitalist system and the workers become just living capital In particular, the worker under a capitalist system is bound to make a distress sale of his labour In other words, he works not because he finds an incentive to develop himself, not because there is an environment congenial for the full efflorescence of his potentialities He works out of dire necessities Ernest Mandel, a Marxist economist, correctly pointed out, "at the beginning of the capitalist system—as still today in a large part of the third world these needs were reduced, moreover, to the almost animal level of subsistence and physical reproduction ' Capitalist society is a society the very basis of which is commercial, where market rules will involve itself in institutions, legal systems, degenerate forms of luxury living, a commercialised press and entertainment industry and areas of profound social decay and criminality But these capitalist societies suffer from a fundamental contradiction which springs from the class struggle. The exploitation of the workers must continually aggregate the opposition of interests between the classes, and result in over resistance or else the apathy and indifference of the working class All industries political parties, systems of government and the very ideology of capitalism, are therefore shaken by crisis after crisis, conflict after conflict The 'antisocial' attitudes of the workers and their famous 'Blow you, Jack, I'm all right" are direct results of this situation, natural reactions against a system that turns the entire proletariat into 'outsiders', reduced to a passive consumer Isolated from his fellows, the worker builds a wall around his family and sets himself to defend it Alienation is a result of this contradiction of capitalism Professor J K Galbraith of Harvard said, 'An angry God has endowed capitalism with inherent contradictions,' and remember, he is no Marxist

Marx views man of the future as a comprehensively devoloped person of high intellectual capabilities who possesses all the material and spiritual values which have been created for centuries, and who has mastered the creativity of all the foregoing generations concentrated and actualized in cultural values. Marx felt that man is alienated, because he is fragmented and crushed. But this alienation is not imposed upon men by himself, rather it occurs in a process in which all individuals are collectively engaged, but the process in which a collective spirit does not devolop. To think of a situation where alienation ceases to exist, we require the knowledge of humanism as an ideology and as a practice. The recognition of this necessity is not purely speculative. On it alone can Marxism base a policy in relation to existing ideological forms of every kind : religion, ethics, art, philosophy and law—and in the very front rank, humanism. When a Marxist policy of humanist ideology, that is, a political attitude to humanism, is achieved, a policy which may be either a rejection or a critique, or a use, or a support, or a devolopment, or a humanist renewal of contemporary forms of ideology in the ethics. In the political domain this policy will only have been possible on the absolute condition that is based on Marxist philosophy. It is true that in their struggle for a new society Communists as the International has it, want to destroy the old world. But what kind of world do they want to destroy ? It is a world of violence—a world in which a working man is trodden on by a handful of monopolists, a world in which, according to the great proletarian writer Maxim Gorky, dominates the "culture of the fat." We believe that only in a socialist society an individual will be free from all fathers and can attain, morally and spiritually, the greatest possible harmony.

By way of conclusion, we shall make a little digression. In contemporary Marxology (an American school of Marxist thought) and in some writings of Marxists, there is a distinction made quite often between the "Young Marx", an idealist concerned with the survival of human essence in face of alienation, and the "Later Marx", almost exclusively interested in class struggle for the revolutionary abolition of capitalism. Both these formulations betray an extremely incomplete and distorted understanding of Marx's thought. Ashoke Sen, a noted Marxist thinker, aptly commented : "It is in the unity of the young and later Marx .... that we find for the first time in history the emergence of the philosophy of praxis concerned not merely over the abstract ideal of human fulfillment, but with the concrete course of human action in history necessary for the achievement of that noble aim."

[The writer wishes to express his deep sense of gratitude to Ranjan Nag, a 3rd year student (Economics Dept.) of this college for his valuable comments and critical observations.]

Beyond Babel
or What is it like to be you ?

Abheek Barman

"When I use a word, "Humpty Dumpty said, ,' it means what
I choose it to mean—neither more nor less"
"The question is," said Alice, "whether you *can* make words mean so many different things"
"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master—that s all

Through the Looking Glass, VI

Nonbeing must in some sense, be, otherwise what is it that there is not ? This is the ancient ontological problem, Plato's tangled beard that has frequently dulled the edge of Occam's razor The astute barber may neverthless discover that the problem is essentially in language, intentionality, aboutness, rather than in ontology, the grammar of existence This ontological problem, at least, doesn't exist

The first tangle in Plato s beard arises due to a confusion between meaning and reference This tangle has been worked out by cleaving semantics into two branches the theory of meaning and the theory of reference The main concepts in the theory of meaning are *synonymy* (or sameness of meaning), *significance* (or possession of meaning) and *analyticity* (or truth by virtue of significance) For complex propositions another concept is *entailment* or analyticity of the conditional The main concepts in the theory of reference are *naming, truth, denotation* (or truth of) and *extension.* Another is the notion of *values* of variables

One of the tasks of philosophy, Wittgenstein maintained, was the clearing of decks "All that philosophy can do,' he wrote, "is to destroy idols And that means not making any new ones, say out of 'the absence of idols And elsewhere, "what we are destroying is nothing but houses of cards, and we are clearing up the ground of language on which they stand" The theory of meaning, alas, has not fared well before this vigorous spring cleaning in the mansions of philosophy

One of the most astute and perhaps the most influential cleaners in this respect has been W V O Quine of Harvard and it is his broom that we shall borrow to clear the mess that the theory of meaning is From a strictly logical point of view tnere are two basic ways in which language-users (we) talk about meaning One is significance, the having of meaning and the other is synonymy or sameness of meaning The study of significance is the work of a hypothetical grammarian, who is analysing a hitherto unknown language L to discover the bounds of the class K of 'significant sequences' ie sequences which possess meaning Synonymy correlations which concern sequences with the same meanings as others, engage the lexicographer, also hypothetical and only distantly related to the grammarian

The grammarian on his field trips has collected numerous specimens of significant sequences, and with this experience has drawn up a list of classes of increasing magnitude which will encompass all observed and future members of the class K These classes are

(i) H, tne class of observed sequences excluding those ruled out as linguistically inappropriate or because of being in alien dialects

(ii) I the class of all observed sequences and all that ever will be professionally observed, excluding those ruled inappropriate in H

(iii) J, the class of all sequences ever occuring, now, past or future, within or without professional observation, excluding inappropriateness as above

(iv) K, the infinite class of all these sequences with the exclusion of inappropriate ones, which *could* be uttered without eliciting bizarreness reactions from listeners

Presumably our grammarian could now,by dint of sheer hard work,go about diligently enumerating members of H Theoretically, given an infinite amount of time, he could even work towards a complete enumeration

of all members of H, though this would not help the essentially finitistic nature of his project to any great degree J however, and quite obviously K too, are quite different cups of tea, being impossible to enumerate within any reasonable degree of consistency even granted unlimited time This is because of their very definitional nature, and hence K, being the most inclusive class, is the most impossible to pin down

Thus, H is a matter of finished record, I is , or could be, a matter of growing record, J goes beyond any record, but might retain some commonsense reality, but not even that can be said of K with any confidence The most that the by-now belaguered grammarian can do is to frame his formal reconstruction of K along the grammatically simplest lines at his disposal compatibility with H, plausibility of the predicted inclusion of I, plausibility of the hypothesis of the inclusion of J and the further plausibility of the exclusion of all sequences sequences which may ever (or do) bring bizarreness reactions The joker of course is 'could' in the definition of K—consisting as it does in what *is* (an ontological question) plus *simplicity* of the laws whereby we describe and extrapolate what is All of these combine to make the grammarian s task a thankless one and the poor man, once so optimistic, can really hope to see no light of redemption

Over now to the lexicographer, Dr Johnson reincarnate, toiling to uncover synonymy relations among words Within the language L, his task is to discern and explain the similarities in meaning between two words a and b to an untutored observer The lexicographer's first problem is the problem of interchangeability. It is not only required that true statements remain true and false ones false, after the substitution of a synonym, but that statements go over into statements with which they are, as wholes, somehow synonymous This is circular : forms are synonymous where their interchange leaves their contexts synonymous Its virtue lies in hinting that substitution is not the main point and what is required is some stringent notion of synonymy for long segments of discourse

Long segments of discourse are chosen over shorter segments in approaching the synonymy problem for three reasons .

First, an interchangeability criterion for short forms would be limited to synonymy within the language Interlinguistic synonymy must be a relation between segments that are long enough to bear abstract consideration apart from contents peculiar to a particular language Thus longer segments provide greater scope for the analysis of relatively context-free synonymy relations

Second, longer segments tend to overcome the difficulty of ambiguity or homonymy Homonymy, the property of a word having more than one associated meaning ('cleave is the best example that comes to mind) causes problems of interchangeability For example, if a is synonymous to b, and b to c, then, *sans* homonymy, a is synonymous to c by the standard transitive relation However, if there are two homonymous meanings of b, say b_1 and b_2 and $b_1 \neq b_2$, then a syn b_1, b_2 syn c $\not\Rightarrow$ a syn c, as $b_1 \not\equiv b_2$ Longer sequences, which tend to iron out ambiguities and homonym-generated uncertainties, are more useful than shorter sentences in this regard

Third, for short sequences as in a word say, simple synonym directions have to be supplemented by additional 'stage directions' pertaining to usage and other contextual elements For example, to explain 'addled', the simple synonym 'spoiled has to be supplemented with 'as in egg, and *not* as in brat to make things clear For the lexicographer then, it is useful to broaden the context of 'synonymy in the small to 'synonymy over long sequences' The lexicographer s task now seems cut out to achieving a catalogue of a limitless class of pairs of genuinely synonymous longer forms

Still the lexicogropher requires some *a priori* notion of synonymy for the setting up of an apparatus for collecting significant sequences For shorter sequences the problem here is of infinite regress—it is not sufficient to tell the reader that a, whose meaning he does not know, is synonymous to b, for what happens if b too is unknown to the reader ? It is very well to argue that one can proceed in a multilingual mishmash enumerating synonyms a la Roget, a syn b syn c syn d until the reader comes across some word with which he s familiar and ask him to work back to a but that leaves the issue of a rigorous definition of synonymy dangling

For longer sequences it is not clear whether it makes sense even in principle to think of words and syntax as varying from language to language while the context remains fixed It happens all too often that whole contexts change with the substitution of close synonyms between languages, a problem familiar to all translators Yet precisely this same fiction is sought to be maintained in speaking of synonymy However what provides

the lexicographer with an entering wedge is the fact that there are many basic features common to Man's ways of conceptualizing his environment, transcending linguistic barriers And here it will be apparent that the lexicographer along with the grammarian has to fall back upon old and conceptual notions of meaning related to contextual patterns and cognitive frames that have evolved from society's collective consensus

It was Plato who pointed out (in Cratylus 432-5) that the meaning relation could not be founded entirely on a synonym relation No signs, he argued could be exactly similar to the thing signified without duplicating it in every respect What is supposed to count is likeness in *relevant respects*, governed by the Platonic *nomos* or convention But even here, in the signifying of *logos* by *nomos*, in the embedding of synonymy in contextual patterns, it would be wrong to mistake meaning for reference There may be two words for the same thing, and one may be a good translation, while the other is not The conflict here is between differences in Weltanschaung, and the lexicographer s last refuge is to appeal to the simplicity and aesthetics of the growing system Pending some definition of synonymy, this is worse than *ex pede Herculem*, for while one may make mistakes in projecting Hercules from the feet, here there is nothing for the lexicographer to be right or wrong about there is no statement of the problem.

Quine has suggested what he sees as the only fruitful notion of synomymy ' a notion of degree Eschewing the dyadic notion of a syn b he proposes a tetradic relation : a more syn to b than c to d But this system too begs a definition The problem, whether in the dyadic system of absolute synonymy or the tetradic system of comparative synonymy, is in making up our minds as to what the speaker of the other language really wants to say when he says what we want to translate Unless in fairly straight forward (and limited) contexts of immediate reference to objects at hand it seems that not only grammar and syntax, but also context variations across languages are impossible to circumscribe in any context-free notion of meaning

To return now to Plato's beard, we have seen how the theory of meaning fares in the analysis of discourse Obviously, devoid of any rigid formulation of significance and synonymy, it fails to satisfy the criteria for a consistent logical system The key to the solution of the riddle lies in the theory of reference

Reference is *about* things The formal theory of reference therefore is about things of unquestioned ontological pedigree As such the theory of reference throws up fewer ambiguities at the cost of being naturally restrictive With regard to material objects, reference, naming, denotation etc are not a problem However, to deal with abstract (and often confounding) propositions like Plato's beard requires slightly more sophisticated tools

Russell s theory of types is the referential shears most suited for tonsorial surgery Here every sentence is analysed in terms of 'bound variables'—logically indisputable, quantifiable words like 'is', 'not , 'something', 'nothing', 'all' and 'some' These words, far from purporting to be names of things, are not names at all , they refer to entities generally with a studied ambiguity peculiar to themselves These bound variables, of course, are a basic part of language and their meaningfulness at least in context, is unchallenged However their meaningfulness in no way presupposes there being either the existence of something called 'nonbeing or for that matter 'Occam's razor' or any specifically preassigned objects, however abstract For the mathematically initiated, it will be useful to think of bound variables as mathematical operators and terms like 'nonbeing' etc , as variables whose real existence is in no way necessary

Now, Plato s beard, the being of nonbeing to justify something which really is *not*, may be formally analyzed into

Nonbeing is not and there exists nothing which is not

Hopefully such a barrage of negations will serve to convince even the most hardnosed Platonist of the futility of verbal games which impute the responsibilities of ontological existence on nonbeings innocent of such complications

In putting to rest Plato's hirsute nonentity we have come across a few major insights into the nature of discourse Foremost of course, has been the fall of meaning from its previous exalted state In attempting to formulate a rigid and consistent class of significance we have found ourselves woefully inadequate to the task and thereby discovered the essential incompleteness of such a formal class No consistent class of significant sequeness can ever aspire to completeness in a language still being used

Second, we have seen how synonymy relations are impossible to achieve in a context-free vacuum. The entire notion of synonymy, and to a large extent significance too, depends on contextual connotations, those age-old conventions and cognitive frames evolved in every culture for the decipherment of the world. Quine's major achievement in the field of semantics has been this—the underlining of the futility to derive context-free analyses of discourse.

The intuitive jump Quine made was to shift attention from earlier attempts to define what was 'cognitively meaningful' to what actually is involved in one person's understanding of another's language. The attempt that I make to surmount the subjectivity barrier that separates 'my' language from 'yours'. The best that the lexicographer can do is to collect linguistic data, observing the conditions under which the people whose discourse is under study assent to or dissent from certain sentences. He then selects basic elements about language by proposing 'analytic hypotheses' which are the rules by which the language being studied is organised. He then tries to fit in his observations with his hypotheses, and this conceptual framework Quine terms 'compositional semantics'. The important point here is that each theory—analytic hypothesis—about the language rules stands or falls by its ability to accomodate the body of data *taken as a whole*. This serves to undermine the idea long held, that sentences or fragments thereof have meaning and that names have reference. The data is never complete and adequate to determine an unique system of interpreting a language. Quine thus replaced Frege's maxim against looking for meaning outside the context of a sentence with a stricture against seeking meaning of an expression outside the context of a language.

Finally we have seen how reference, because of its logical as well as operational rigidity sometimes proves a better tool than the analysis of meaning to clear the undergrowth from the garden of forking paths that language is.

Humpty Dumpty's running battle with meaning for the mastery over words has finally found a victor. It is he, in the guise of conventions and contextual knights who is the master and it is the words who must line up of Saturday nights for to get their wages.

II

> The world is my world : this is manifest in the fact that the limits of language (of that language which alone I understand) mean the limits of my world . .
>
> Tractatus Logico Philosophicus

Thus Wittgenstein, speaking for every one of us, but actually for *each* one of us. Intellect, our proudest 'attribute' stems from consciousness. Yet what is consciousness if not awareness of the self, and by exclusion automatically, awareness of its complementary otherness, not-self. But what of awareness ? And what ultimately is the self—who am I, what are you ?

I see the rain fall from a green, green sky, I see the tree, leaves blue, singed by the rain, hot and burning to the touch, I feel the warm breath on my face ....

This is not really as fantastic as it sounds, nor is it very good S. F. If it strikes you as odd, then that's because you are used to think of the sky as blue, leaves as green, rain as wet and cool—what could be more absurd ? My skies are green, green as the Mediterranean, my trees are blue, my rain scalds at the touch, so what's wrong with you ?

Strangely enough, it seems as if nothing is very wrong with you, neither is anything wrong with me, which is strange, for our world pictures do not seem to agree at all. The real reason why they don't is because of labels. When I was very young, someone pointed to the sky and said, 'well, that is green,' and pointing to the sea (we lived in Corfu), 'and so's that'. So what I took to be green is what you take to be blue, and strangely enough, what I take to mean 'hot' is what you feel cold about, and that rather pleasant shivery feeling, I was told, was really burning.

Such are the strange ways of language. We understand the world to a large extent through experience, and we relate experience via language and here is the importance of contextual cohesion, for my experience is entirely, subjectively mine, and for it to make sense to you, we must both speak the same language—use

the same referential landmarks Here is the tremendous importance and power of language manifest, for trapped within each our subjective realities, language and reference provide the only means of communication and information exchange between our separate universes No man is an island when he speaks the other man's language

If this sounds too obvious that is because we have become increasingly aware of the language dependence of society Yet the subjectivity barrier is the greatest barrier of all, for how may I know how you hear your Bach ? For all the good language does it will never, ever reassure me that the C-minor you hear is the same one I do Which brings us to Barman's beard, tougher and far more resistant to tonsorial decimation than Plato's hirsute adornment

What is it like to be you ?

This is a really tangled one, and not to be dismissed by mere language analysis In fact for those of us inclined to treat transmigration of souls, possession, witchcraft and shamanism with healthy skepticism, downright impossible to answer

Locke took the subjectivity argument to its logical extreme with a wonderful conjecture in the 'Essay Concerning Human Understanding' How do I know, he asks, that you see what I see (in the way of colour) when we look at a clear ' blue" sky ? We both learned the word blue by being shown things like clear skies, so our colour-term use will be the same even if *what we see* is different ! This is a fascinating *gedanken-experiment*, well worth the disconcertion it causes in terms of the insights it yields into our bounded selves "What can be thought," wrote Wittgenstein, "can be thought clearly What can be said can be said clearly What can be shown cannot be said '

Face to face with subjectivity, one is backed into the corner where one has to accept an extremely watered-down version of 'objectivity' as the linguistic, semiological collusion among essentially separate, individual realities On the other hand, turning inwards one is forced to confront the mysterious 'I'. It is this encounter that we shall dwell upon henceforth in the hope of extracting clues about who we are and what this strange creature called the self has for breakfast

I am, I am told, a self My self has a mind, I *have* a mind, which presupposes that I am something more than a mind The question is what ? There is a dualism here that is difficult to get around, but which once accepted, is again vaguely disturbing The notion of a 'mind', something mental, encapsulated within the 'body', something physical, is a venerable one and dates back to Descartes Descartes, trapped within his own mechanistic worldview conceived of the mind as something external to, or beyond the world of physics and quantification I am a substance the whole nature or essence of which is to think, and which for its existence does not need any place or depend on any material thing " There are two radically different kinds of substances physical, *res extensa*—measurable and divisible , and thinking, *res cogitans*—unextended, indivisible, non-corporeal This kind of rigid dualism begs several questions, the chief among which is that of divisibility If the mind and body are essentially distinct, then it should logically be possible for each to exist without the other , we should have actual cases of pure disembodied intellects drifting around traffic jams or genuinely mindless zombies lurking in the parks Another big hitch is the theory of causal interaction—a physical event like my finger touching a flame triggers a physical impulse to the brain which reacts with a mental shout of pain, sending back a physical command to withdraw the finger from the source of heat Descartes skipped this question by airily announcing that mind and body 'intermingle' sometimes, to form an unit, but that again is begging a question of degree The degree of intermingling of mind and body and the locus of dissociation when they do not mingle

Gilbert Ryle of Oxford has consistently propounded a revolutionary theory of the mind which detracts from the Cartesian 'strict dualism' picture Descartes, Ryle concedes, recognized correctly that men were different from machines, but was wrong in attributing the difference to non-physical and non-corporeal explanations of the mind The postulation of the alternative Cartesian intellect-world, beyond physics, *res cogitans*, was scathingly termed by Ryle as the doctrine of 'the Ghost in the Machine'.

That there are mental phenomena and that these do not seem to obey physicalist spatio-temporal laws is not disputed by Ryle What he objects to is the counting of worlds and what he sees as the traditional fallacy of conceiving the self in 'ghost in the machine' terms It is uncontestable that I have a mind, but it

is not that I could conceive of myself without the mind The machine' with its resident ghost exorcised is inconceivable Ryle argues that mental events are dispositional in character and thus to describe a person as intelligent does not imply that occult events occuring 'in the mind' are influencing other events occuring 'in the body', it indicates some of the things one is disposed to do if certain circumstances arise

Again, all of language concerned with mentalistic phenomena displays a curious dualistic slant, We speak of having thoughts, of having minds and intellects, of exercising our mental faculties and so on Granted that the problem in this respect is essentially in language, it is nevertheless not difficult to appreciate what deep inroads the Cartesian mind body duality model has made into society's patterns of thinking about thinking Language after all is our collective perception of reality, and if there is something basically wrong with representation, one may be justified in assuming that something is amiss by way of actual perception

III

They hunted till darkness came on, but they found
Not a button, or feather, or mark,
By which they could tell that they stood on the ground
Where the Baker had met with the Snark

The Hunting of the Snark, VIII

It is unfortunate, but true nevertheless, that Descartes ghost may not be exorcised easily To put it another way, the haunting of the machine seems to be subliminal, in a very real sense The venerable problem resurfaces under different guises and may not be dismissed , yet the search for a solution goes on

The brain, we now know is mechanically relatively uncomplicated, consisting of neurones in prodigious numbers which function essentially as switches Nerves all over the body transmit electrochemical impulses back to the brain, which are channelled to local receptor sites and if the volume of stimuli collectively cross a certain critical threshold, it prompts a section of neurones to fire The collective effect of these firings or non-firings constitute the totality of how we react, learn, perceive, understand, feel, behave—in essence determine who we are

Now here is a riddle if there was one A number of impulse stimuli trigger neural firings or do not trigger them, in effect throw certain on-off switches, and whole world views, personalities emerge therefrom We perceive the world and ourselves not in terms of neural switchings but in terms of concepts, involving large scale clumpings of ideas Our view of our brain is not as a storehouse of neurones but as a store house of beliefs and ideas We do not perceive things in terms of small scale stimuli, but in terms of desires, anxieties, hopes, ideas and abstractions, all of which are large-scale phenomenological states Yet these very concepts are translated or broken down into millions of loops firing Clearly there is a level crossing going on somewhere, a transition from large scale contextual abstractions to microscopic on-off switching, from *qualia* to *quanta.*

This dichotomy, between *qualia* and *quanta,* between the complex levels of concepts and the relatively simple one-choice level of neural switches, is perhaps the most persistent of all problems dogging the heels of cognitive science It is also the basis behind the controversy between 'emergence and 'reduction' in epistemology, between 'holism' and 'reductionism It is sometimes raised as an objection to science that reducing complex issues to simpler terms produces a loss of significance, bits of eggshell do not a Humpty Dumpty make This is the holistic critique of science s reduction of complex issues to simpler parts or constituents The reductionist thesis has been to assert that holistic explanations may not ultimately explain the building blocks of matter—a broken piece of machinery, say a typewriter will not work if a tiny component within is damaged, and it's no use talking of the holistic nature and functions of typewriting to set it right. To fix the machine, it s got to be taken apart

However, it has been observed that when parts are combined, surprising or mysterious 'emergent' properties may appear—mysterious because reduction descriptions are inadequate A familiar example is the creation of water through the combination of the gases oxygen and hydrogen, which have totally different properties

from the end product water Just as the properties of water are different from those of its constituent gases, it has been suggested that the mind may similarly be emergent upon physical brain structure or activity

The point again appears to hinge on a difference in levels—lower level functions (lower in terms of complexity) obey essentially different laws than successively higher level functions Complex systems are inherently different from simple ones, so that a complex system may not be viewed as an arithmetical aggregate of simpler constituents The science of complex systems is a new one, and branches extend in numerous directions, from information theory to the study of entropy and chaos theory The pioneering work of Ilya Prigogine and his associates constitute one of the most breathtaking advances in science, and his results and worldview are beautifully set forth in the book 'Order out of Chaos' by Prigogine and Isabelle Stengers

The valid methodological standpoint to take it seems is 'hierarchical reductionism', a word coined by the Oxford biologist Richard Dawkins, who points out that there are really no whole-time reductionists, just as there are no full-time holists—both are convenient strawmen for casting methodological darts at, and what we *actually* do is shift our attention all the time as we progress up or down levels of complexity to try to derive the laws pertaining to *that* level He contends that " the kinds of explanations which are suitable at high levels in the hierarchy are quite different from the kinds of explanations which are suitable at lower levels This (is) the point of explaining cars in terms of carburettors rather than quarks But the hierarchical reductionist believes that carburettors are explained in terms of smaller units , which are explained in terms of smaller units , which are explained in terms of smaller units and so on right down the line, with each step having different laws to operate by The problem with the analysis of mind is not in methodology, but in the fact that so many of the layers, or hierarchies seem beyond conceptual grasp. The mind is perhaps, as the Zen saying has it, "like the eye that sees but cannot see itself

Our study of the mind has taken us along numerous paths, forking, branching out in different directions through the various gardens of ideas, concepts, language and life There is one more path that we shall take, one more strand that we shall attempt to weave into the growing tapestry, the enchanted garden without frontiers that cognitive science, the philosophy of the self, is

IV

> For we do indeed suffer from the illusion that the sublime and essential part of our investigation resides in grasping a single all embracing essence
>
> Philosophical Investigations

> "And if he left off dreaming about you, where do you suppose you'd be ?
> "Where I am now, of course," said Alice
> "Not you ! Tweedledee retorted contemptuously You'd be nowhere Why, you're only a sort of thing in his dream ! '
>
> Through the Looking Glass, IV

The Greeks discovered the axiomatic method and with it, the branch of philosophy called 'deductive logic whence we accept without proof certain propositions called axioms or postulates and derive from these all other propositions of the system as theorems The power of the axiomatic system grew over the past two centuries, generating a climate of opinion in which it was tacitly assumed that each sector of mathematical thought could be supplied with a set of axioms sufficient for developing systematically the endless totality of true propositions about the area of inquiry

The German mathematican David Hilbert initiated a program to derive the full formal codification of human logic as applied in mathematics The work was taken up by Russell and Whitehead in their monumental Principia Mathematica The project turned on the question of whether a given set of postulates serving as foundation of a system is internally consistent, so that no mutually contradictory theorems can be deduced from the postulates A general method of solving the problem was devised, the underlying idea being to find a model for the abstract postulates of the system, so that each postulate is converted into a true

statement about the model. However, the snag which remained was that non-finite systems, necessary for the interpretation of most postulate systems of mathematical significance can be described only in general terms ; we cannot conclude as a matter of course that descriptions are free from concealed contradictions. What was necessary was a complete axiomatization of mathematics.

An essential requirement of Hilbert's program therefore was that demonstrations of consistency involve only such procedures as make no reference either to an infinite number of structural properties of formulas or to an infinite number of operations with formulas. Such procedures are finitistic, and a proof of consistency conforming to this requirement is called 'absolute'.

Russell and Whitehead's goal was therefore to devise an absolute proof of consistency for all branches of mathematics which could also lay claim to completeness. The result was the *Principia.*

In 1931, the great Austrian mathematician Kurt Godel published a paper called "On formally Undecidable Propositions in Principia Mathematica and Related Systems." In it, proposition VI states that :

> To every W-consistent recursive class K of formulae there correspond recursive class-signs r, such than neither v Gen r nor Neg (v Gen r) belongs to flg (K) (where v is the free variable or r).

Paraphrased in 'normal' English it says :

> All consistent axiomatic formulations of number theory include undecidable propositions.

This is the statement of Godel's famous Incompleteness Theorem, which proved once and for all time that the ambition to develop complete, consistent, absolute sets of axioms for all branches of mathematics was untenable. Every closed and consistent logical system contains undecidable propositions and is hence inherently incomplete. Godel's paper, apart from laying to rest the Hilbert-Russell-Whitehead program of axiomatization of all mathematics, opened up new vistas by the suggestion that all logical systems, formal systems have the demon of incompleteness lurking within. This has had tremendous philosophical, mathematical logical and cognitive consequences, and it is beyond the scope of this paper to go into it in any detail.

For our purposes, it will be sufficient to extract only two of the pearls of significance from Godel's Theorem. The first of course is the essentially incomplete nature of formal systems. The second relates to Godel's method of proving his theorem—a system called Godel numbering whereby it is possible for a finitistic system to fold back upon itself for descriptive purposes without falling into endlessly recursive referential loops. The significance of this lies in the fact that if every system is incomplete, then the only way in which a system at a certain level of complexity may be analysed is obviously from a system higher up in the complexity scale. However Godel sentences within the system may through their very nature underline the incompleteness of the system from within.

Hence the reason for involving Godel in our journey through the mind. The purpose is to formulate tentatively a Godelian theory of cognition. Recent researches into the mechanisation of intelligence have aimed at the duplication of the 'hardware' of the brain's physical structure through parallel processing, neural network devices and so on. However the essence of cognitive activity seems to be embedded in the 'software' aspect. If there exists within us any alogrithm that generates the high-complexity existential concepts we call 'thoughts' 'ideas' and 'concepts' then they might arise not from the simple mechanics of neural switches but from a higher level 'conceptual algorithm' which in turn generates ever higher structures of abstract thought, perception, pattern recognition, learning and ultimately, self awareness.

It is tentatively suggested here that such mental algorithms if they exist as consistent, logical structures are essentially Godelian. This will help to account for our 'self referential blind spot' whereby the I sees, but cannot see itself.

In simplistic terms; the Godel sentence for some level of the mind that handles high level functions like self reference may run like :

> I cannot consistently assert this sentence.

Which throws the system into a loop difficult to get out of, because perhaps of the incompleteness of the system

Such a model of cognition, like Godel's own theorem need not plunge us all into melancholy Godel s system does not preclude the formations of consistent systems suited for functions at their defined levels The only thing with an attached caveat is the attempt to formulate systems aspiring to overall completeness generating absolute proofs While this explains how we are perfectly able to perform thousands of mental tasks, it also has the virtue of attempting a formal explanation for the minds failure to encompass itself in its own terms with any degree of completeness What this augurs for the cognitive sciences is difficult to predict but that shouldn t deter us from trying to pull ourselves up by our bootstraps

The language that the mind and we, use is a lower level language to describe epiphenomena, and to encapsulate the functions of the mind will require a language that is 'meta-mental'—a level higher than our current cognitive level Whether this is even theoretically possible is doubtful but seems an inescapable conclusion from our work and Godel s conclusions. The correct path was perhaps that enunciated by Wittgenstein when he concluded the *Tractatus* by ringing down the curtain on all philosophical quest, *Whereof one cannot speak thereof one must be silent" Or as the Zen master pronounced many centuries ago*

He who speaks does not know
He who knows does not speak

Bibliography

1 Carroll, L—Through the Looking Glass
—The Hunting of the Snark
2 Dawkins, R —The Blind Watchmaker, Harmondsworth, 1986
3 Gregony, R L (ed)—The Oxford Compainon to the Mind, Oxford, 1988
4 Hofstadter, D R —Godel, Escher, Bach · An Eternal Golden Braid Harmondsworth, 1984
5 Hofstadter D R and Dennett, D C —The Mind s I, Harmondsworth, 1982
6 Kenny, A —The Legacy of Wittgenstein, Blackwell, 1984
7 Pears, D F —Wittgenstein Fontana 1988.
8 Nagel, E and Newman, J R —Godel's Proof, Routledge and Kegan Paul, 1981
9 Quine, W V O —From A Logical Point of View 9 Logico-Philosophical Essays Harvard, 1980
10 Ryle, G—The Concept of Mind, Harmondsworth, 1963
11 Wittgenstein, L —Tractatus Logico-Philosophicus, RKP, 1961
12 Wittgenstein, L —Philosophical Investigations, Blackwell, 1958

সূচীপত্র

স্মৃতিচারণ		সুনীল রায়চৌধুরী
সম্পাদকীয়		
প্রাচীন ভারতে হিন্দু গণিত	১	রত্না দত্ত
সমসাময়িক রাজনীতি	৮	প্রশান্ত রায়
হোমিও বিতর্ক	১০	সুদীপ্ত সরস্বতী
ক্রীড়াভূমি	১৩	অমিতেন্দু পালিত
একটি অ্যাভিশনল কম্পালসারি পত্রের প্রশ্ন অথবা উত্তর ধরা যেতে পারে	২০	চিরঞ্জীব সরকার
সত্য তার সীমা ভালোবাসে	২২	দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিনী চৈচৈ · ··	২৫	বিপ্লব মুখোপাধ্যায়
শ্মশান বান্ধবী	২৯	সুপ্রিয় ঘোষাল
রূপান্তর	৩১	সৌম্য দাশগুপ্ত
স্বায়ত্ব রেখা বরাবর	৩২	তন্ময় মৃধা
নষ্টচন্দ্র	৩৩	অচ্যুত মণ্ডল
গালিলিও গালিলেও	৩৪	ব্রাত্য বসু
অনুরাধা ঘোষের কবিতা	৩৫	অনুরাধা ঘোষ
রাত কাটলেই	৩৬	অর্পণ চক্রবর্তী
সঙ্গম অথবা ··	৩৭	শমিত রায়
তিষ্যা আমার এক শিষ্যায় নাম	৩৮	শিলাদিত্য চক্রবর্তী
তবু আমি ভালবাসি ···	৩৯	যশোধরা রায়চৌধুরী
কপালে তার ধুলো	৪০	অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য
অজ্ঞাত মৃত্যু	৪১	বিবেক সেন
কলকাতার রূপান্তর	৪৭	অতীন্দ্র মোহন গুণ
সংসার যবে . .	৫৩	অর্ণব রায়
'পৃথিবীর সমস্ত লোক অন্ধ হয়ে যাক' (অমরনাথ দে-র সঙ্গে অদ্রীশ বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার)	৫৮	অদ্রীশ বিশ্বাস
উলটপুরাণ	৬৩	অপূর্ব সাহা
যে আসে	৬৪	ইন্দ্রনীল রায়
ক্রিমিয়া যুদ্ধের সৈনিকের প্রতি	৬৪	রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাসঙ্গিকী	৬৫	
পরিচিতি	৬৭	

প্রাচীন ভারতে হিন্দু গণিত

রত্না দত্ত

ভারতবাসী স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ, বস্তুতন্ত্রতাহীন ভাবাতিশয্য তাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ—একথা কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কৃপায় প্রায়ই শোনা গেছে এবং এই ধারণা এত বহুল প্রচারিত যে অনেক ভারতীয় পণ্ডিতও বলেন যে ভারতবর্ষ চায় সৌন্দর্য, আলো, বকুল—জুঁইয়ের প্রাণমাতানো গন্ধ, বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। ভারতের বহিঃপ্রকৃতিই নাকি এর জন্য দায়ী। প্রাচীন ভারতে অল্প আয়াসেই খাবার জুটত বলে কাব্য ও দর্শনের ছড়াছড়ি কিন্তু বিজ্ঞানের কোন চর্চা হয়নি।

কিন্তু আসল কথা এই যে কাব্য ও দর্শনের মত বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতবর্ষ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল। সে যুগে বিজ্ঞানেও যে কোন দেশ ভারতের সমকক্ষ ছিল না তার পরিচয় প্রাচীন পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করলে বোঝা যায়। ভারতবর্ষ উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু তাই বলে বাস্তবকে ভোলেনি।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার আমাদের কাছে প্রমাণ করে যে ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেরও আগে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা যাপন করত এক উন্নত জীবন। প্রাচীন নথিপত্র যেমন বেদে, আমরা দেখি সভ্যতার এক উচ্চতর অবস্থান। ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও অতীন্দ্রীয় দর্শনের যেমন সমাবেশ আছে, তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় সেকালের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা যা কিনা আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ। ব্রাহ্মণ্য যুগের এই অগ্রগতি অব্যাহত ছিল দু'হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে। বৈদিক যুগেরও আগে বিজ্ঞানের জন্ম হয় ধর্মকে সাহায্য করার জন্য। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চেতনায় ধর্মীয় কারণ মূল উৎস হলেও—এরকম অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যেখানে নিজের প্রয়োজনেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদে একটি গল্প আছে যা প্রাচীনকালের বিজ্ঞান চেতনারই প্রতীকস্বরূপ। একবার নারদ সন্ন্যাসী—সনৎকুমারের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করেন। তখন সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করেন যে এখনও পর্যন্ত নারদ কি কি বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে নারদের আর কী কী শিক্ষা বাকী। তখন নারদ বিভিন্ন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের নাম করেন যার তালিকায় রয়েছে নক্ষত্রবিদ্যা ও রাশিবিদ্যা। পরবর্তীকালে জৈনরাও গণিতচর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের একটি অংশ ছিল 'গণিতানুযোগ'। সংখ্যাজ্ঞান জৈন সাধুদের অন্যতম কৃতিত্ব বলে গণ্য হত। বৌদ্ধ সাহিত্যেও গণনা ও সংখ্যাজ্ঞানকে প্রথম এবং সবথেকে গৌরবজনক মনে করা হত। এ সবকিছুই প্রাচীন ভারতে গণিত চর্চার মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে এক পরিষ্কার ধারণা দেয়। মহাবীর ছিলেন সেকালের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। তাঁর মতে এই ত্রিভুবনের সবকিছুর (গতিশীল-গতিহীন যাই হোক না কেন) অস্তিত্ব গণিতকে নিয়ে।

'গণিত'—শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'গণনা বিজ্ঞান'। শব্দটি অনেক প্রাচীন, সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের। ১২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বেদাঙ্গ জ্যোতিষে গণিতের স্থান ছিল সব থেকে উপরে। সেখানে তিন রকমের শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। (১) মুদ্রা, (২) গণনা, (৩) সংখ্যা। জ্যামিতিকে বিজ্ঞানের অন্য শাখায় ধরা হত—যার নাম 'কল্পসূত্র'। তবে সাধারণভাবে 'গণিত' বলতে সমস্ত অঙ্ক শাস্ত্রকেই বোঝায়। গণনা করার জন্য কিছু লেখার সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল। কাঠের পাটাতনের (পাটী) উপর চক দিয়ে বা বালির (ধূলি) উপর লেখা হত। এইভাবে 'পাটীগণিত' শব্দটির উৎপত্তি। তবে বিশ্বাস করা হয় যে 'পাটীগণিত' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ নয়—এটার

উৎপত্তি উত্তর ভারতের একটি দেশীয় ভাষা থেকে। পরবর্তীকালে অঙ্কর নিয়ে যে গণিত—তাকে বীজগণিত বলে অভিহিত করা হয়। ৬২৮ খ্রীঃ ব্রহ্মগুপ্ত এই বিভাজন করেন, যদিও তিনি 'বীজগণিত' কথাটি ব্যবহার করেন নি। ৭৫০ খ্রীঃ শ্রীধরাচার্য পাটীগণিত ও বীজগণিতের উপর আলাদা করে লেখেন।

গ্রীকদের যেমন myriad (10^4) এর উপর, রোমানদের mille (10^3) এর উপর সংখ্যাকে নামকরণের জন্য কোন পরিভাষা ছিল না। সে সময় প্রাচীন হিন্দুরা আঠারোটিরও অধিক নামকরণ সহজেই করতে পারতেন। বর্তমানেও অন্য যে কোন জাতির তুলনায় হিন্দুদের নামকরণ অনেক বেশী নির্ভুল এবং বিজ্ঞান-সম্মত।

পরবর্তীকালে ৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে দেখা যায় 'শতকিয়া' স্কেলের উপর নির্ভর করে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যা নামকরণের সফল পদক্ষেপ। মহেঞ্জোদারো এবং অশোকের শিলালিপিতে এই সংখ্যাতত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৮—এই সংখ্যাটির উল্লেখ ঋগ্বেদে এবং যজুর্বেদ-সংহিতায় 10^{12}-এর মত বড় সংখ্যার নামেরও উল্লেখ আছে। অশোকের শিলালিপিকে ব্রাহ্মি এবং সে সময়কার অন্যান্য শিলালিপিকে খারোষ্ঠি বলা হয়। মেগাস্থিনিসের লেখায় মাইলস্টোনের কথা আছে যা কিনা রাস্তার উপর বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব নির্দেশ করে এবং নিশ্চয়ই সেটা সংখ্যা দিয়েই করা হত। আধুনিক হিসাব শাস্ত্রের জটিল পদ্ধতিকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সমর্থন করে।

এরপর আসা যাক শব্দ সংখ্যা বিষয়ে। শূণ্য এবং ১ থেকে ৯ পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলিকে শব্দ দিয়ে প্রকাশ শুরু হয়। সংস্কৃত ভাষার আগে আর কোন ভাষায় এরকম প্রকাশ রীতি দেখা যায়নি। Word-numerals এর ব্যবহার ৪০০ খ্রীঃ বা তারও আগে 'অগ্নি' পুরাণে দেখা যায়। পুরাণের বিষয় মানেই সাধারণ লোকেদের জন্য। এর থেকে বোঝা যায় যে অন্ততঃ তারও ২০০ বছর আগে এই word – numerals আবিষ্কৃত হয়।

শূণ্যের ব্যবহার ২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে পিঙ্গলের 'ছন্দ সূত্রে' দেখা যায়। ৫০০ খ্রীঃ 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা'তে শূণ্যের ব্যবহারের বিভিন্ন উল্লেখ আছে। সেখানে শূণ্যকে ১, ২, ৩-এর মতই একটা সংখ্যা হিসেবে ধরা হত। শূণ্যের যোগ বিয়োগেরও ব্যবহার ছিল। ৫২৯-৫৮৯ খ্রীঃ বরাহমিহির শূণ্যের ব্যবহারের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেন। সেখানে ২২৪,৪০০,০০০,০০০ কে প্রকাশ করা হয়— বাইশ চুয়াল্লিশ এবং আটটি শূণ্য হিসেবে।

আরবদের নিয়মিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা শুরু হয় ৬২২ খ্রীঃ মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় আসার পর। ইসলামের প্রচার সফল হয়েছিল আরবদের একটি শক্তিশালী জাতিরূপে তৈরী করাতে। আরবীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শুরু হয় ৭৫০—৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। যুদ্ধবিজ্ঞান, অস্ত্রবিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি এবং ওষুধের উপর কিছু বই ভাষান্তরিত হয়েছিল সংস্কৃত ও পার্সী ভাষা থেকে। তারা বিজ্ঞানের কাজকর্ম ভারত ও গ্রীস থেকে সরাসরি নিয়েছিল। খালিফ-অল-মনসুরের সময় কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি বিভিন্ন গণিত বিষয়ক কাজকর্ম এবং ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত', 'খন্ড-খাদ্যক' নিয়ে যান এবং আরবীভাষায় রূপান্তরিত করেন, এর ফলে আরবীয় গণিতবিদ্যা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এটা সঠিকভাবে বলা যায় না, ঠিক কখন হিন্দু সংখ্যাজ্ঞান ইউরোপে পৌছয় তবে ধরে নেওয়া হয় পঞ্চম শতকের শেষদিকে তা দক্ষিণ ইউরোপে পৌঁছয়।

পরবর্তীকালে লেখকেরা পাটীগণিতকে 'ব্যক্তগণিত' বলে অভিহিত করতেন যেখানে বীজগণিতকে বলা হত 'অব্যক্তগণিত'। গণিতশাস্ত্র আরব ভাষায় রূপান্তরিত করার পর পাটীগণিত ও বীজগণিত শব্দ দুটির উচ্চারণ দাঁড়ায় 'ilm hisâb-al-takht' এবং 'hisâb-al-ghobar'.

ব্রহ্মগুপ্ত অনুসরণ করলে আমরা দেখি যে সে সময় পাটীগণিতে কুড়িটি নিয়ম প্রণালী (Operation) ও আটটি নির্ধারণ নীতি (Determinants) ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত বলতেন 'যিনি এই কুড়িটি নিয়ম (Operation) ও আটটি নির্ধারণ নীতি (Determinants) জানেন—তিনি একজন গণিতজ্ঞ'।

এই কুড়িটি নিয়ম হল (বোঝার সুবিধের জন্য ইংরেজীতে দেওয়া হল) : 1. Addition, 2. Subtraction, 3. Multiplication, 4. Division, 5. Square, 6. Square root, 7. Cube, 8. Cube root, 9—13. The five rules of reduction relating to the five standard forms of fractions. 14. The rule of three, 15. The inverse rule of three, 16. The rule of five, 17. The rule

of seven, 18. The rule of nine, 19. The rule of eleven, 20. Barter & exchange. এবং বাকী আটটি নির্ধারণ নীতি হল : 1. Mixture, 2. Progression, or Series, 3. Khsetra, 4. Excavation, 5. Stock, 6. Saw, 7. Mound, 8. Shadow.

পাটীগণিত বিষয়ক যে সমস্ত পুঁথিপত্র পাওয়া যায় তা হল—'বখশালি পাণ্ডুলিপি' C. 200), 'প্রতাটিকা' (C. 750), 'গণিত-সর-সংগ্রহ' (C. 850), 'গণিততিলক' (1089 A.D), 'লীলাবতী' (1150 A.D), 'গণিত কৌমুদী' (1356 A.D), এবং 'পাটীসর' (1658 A.D)। এছাড়াও একাধিক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক লেখা পাওয়া যায় যেগুলোকে 'সিদ্ধান্ত' বলা হয় এবং যার মধ্যে গণিত সম্পর্কিত একটি আলাদা অধ্যায় থাকত। ৪৯৯ খ্রীঃ আর্যভট্টই প্রথম তা চালু করেন এবং পরে ৬২৮ খ্রীঃ ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভট্টকে অনুসরণ করেন এবং আস্তে আস্তে এটাই প্রথা হয়ে দাঁড়ায়।

ভাস্করাচার্যের মতে পাটীগণিতে সমস্ত নিয়মপ্রণালীকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যদিও প্রথানুযায়ী তা চার ভাগে (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) করা হয়। এই দুটি বিভাগ হল—'বৃদ্ধি' ও 'হ্রাস'।

ভাবতেও অবাক লাগে যে বর্তমান অংকশাস্ত্রের ভিত যেসব নিয়ম—তার অনেক কিছুই সেই প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। মাত্র কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল :—

মহাবীর, ভাস্করাচার্য : $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$

কিম্বা : $(a+b+c+.....)^2=a^2+b^2+c^2....+2ab+.....$

শ্রীধর, মহাবীর : $n^3=1+3+5.....$nতম রাশি পর্যন্ত।

নারায়ণ : $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab.$

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত সব নিয়ম অখন্ড সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত।

মহাবীর : $(a+b+c+...)^3=a^3+3a^2(b+c+....)+3a(b+c+....)^2+(b+c+....)^3$

এই সূত্রটিকেই শ্রীপতি এবং ভাস্করাচার্য অন্যভাবে বলেছেন।

$$(a+b)^3=a^3+3ab(a+b)+b^3.$$

মহাবীর : $n^3=n(n+a)(n-a)+a^2(n-a)+a^3$

উপরোক্ত ঐ নিয়মটিকে শ্রীধর, শ্রীপতি, নারায়ণ প্রভৃতিরা প্রকাশ করেছেন একটি series হিসেবে :

$$n^3=\sum_{1}^{n}\{3r(r-1)+1\}.....$$

প্রাচীন বিবরণ থেকে পাটীগণিতের বিভিন্ন নিয়মসমূহের দ্বারা কষা অংককে যাচাই করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আর্যভট্টের 'মহাসিদ্ধান্তে' (C. 950) পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি ভারতেই প্রথম চালু হয়। 'নয় বাদ দিয়ে' যাচাই করার নিয়মটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নারায়ণ'ই এ ব্যাপারে প্রথম হিন্দু গণিতজ্ঞ।

সুদ, মূলধন, সময় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের বিভিন্ন উপায় হিন্দুদের লেখায় পাওয়া যায়। 'মিশ্রক ব্যবহার' নামে একটি আলাদা বিভাগ থাকত। এধরনের সমস্যার সঙ্গে জড়িত আর্যভট্টের করা সমাধানে দ্বিঘাত সমীকরণের (Quadratic equation) উল্লেখ এবং তার থেকে অজ্ঞাত রাশির মান পাওয়া যায়। যথা : $tx^2+px-Ap=0.$

সমাধান : $x=\dfrac{-p/2\pm\sqrt{(p/2)^2+Apt}}{t}$ যেহেতু সুদের হার ঋণাত্মক হতে পারে না, সুতরাং

$x=\dfrac{-p/2+\sqrt{(p/2)^2+Apt}}{t}$ এজাতীয় গভীর চিন্তাভাবনাও আমরা প্রাচীন হিন্দু গণিতজ্ঞদের মধ্যে দেখতে পাই।

জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধানের জন্য গণিতকে ব্যবহার করা এবং তাতে হিন্দু গণিতজ্ঞদের আশাজনক সাফল্য আজও আমাদের অবাক করে দেয়। কারণ সেই সাফল্যের ফল আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। মহাবীর নিম্নোক্ত বীজগাণিতিক প্রমাণ দুটি জানতেন :

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=\cdots\cdots=\frac{a+c+e+\cdots}{b+d+f+\cdots}$$

এবং $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a-c}{b-d}$;

খ্রীষ্টাব্দ শুরুর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে 'শূণ্য'র আবিষ্কার হয় দশমিক স্কেলের সুবিধার জন্য। কিন্তু এতেই ক্ষান্ত হয়নি হিন্দু গণিতজ্ঞদের চেষ্টা, যতদিন না 'শূণ্য' অন্যান্য সংখ্যার মতই আর একটি সংখ্যা রূপে পরিগণিত হয়। এই ব্যবহার শুরু হয় ৩০০ খ্রীঃ যখন 'বখশালি' পাণ্ডুলিপি লেখা হয়। শূণ্যের যোগ-বিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায় ৫০৫ খ্রীঃ লেখা বরাহমিহিরের 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা'তে। আর্যভট্টের জীবনীর উপর ভাস্করাচার্যের ভাষ্যে সম্পূর্ণ দশমিক পাটীগণিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শূণ্য দিয়ে বিভিন্ন operation এর উল্লেখ পাওয়া যায় ৬২৮ খ্রীঃ ব্রহ্মগুপ্ত এবং পরবর্তীকালের বিভিন্ন লেখায়। হিন্দুরা পাটীগণিতে যেভাবে শূণ্যকে ব্যবহার করতেন, বীজগণিতে সেভাবে করতেন না।

তাঁরা পাটীগণিতে 'শূণ্য'কে সংজ্ঞাত করতেন $a-a=0$ হিসেবে। এই সংজ্ঞা ব্রহ্মগুপ্ত এবং তৎপরবর্তী সমস্ত কাজে দেখা যায়। তারা শূণ্য দ্বারা ভাগ জানতেন না কিন্তু শূণ্যকে কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করাকে নির্ণয় বলেই জানতেন। আর্যভট্ট তাঁর 'মহাসিদ্ধান্তে'র পাটীগণিত বিভাগে লিখেছেন, 'কোন সংখ্যার সঙ্গে শূণ্য যোগ করলে তা অপরিবর্তিত থাকে এবং ঠিক একই ব্যাপার বিয়োগের ক্ষেত্রে। অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা শূণ্যকে গুণ ও ভাগের ক্ষেত্রে গুণফল ও ভাগফল হল শূণ্য'।

প্রাচীনকালে বীজগণিতে শূণ্যের ব্যবহার পাওয়া যায় ৬২৮ খ্রীঃ লিখিত 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তে'। ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' এবং 'বীজগণিত'—শূণ্যের সঙ্গে বিভিন্ন operation-এর ফল ব্যাখ্যা করে। তিনি বলেন যে শূণ্যের সঙ্গে কোন সংখ্যার যোগের ক্ষেত্রে মান অপরিবর্তিত থাকে যেখানে শূণ্য থেকে বিয়োগের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যার চিহ্ন বদলে যায়। '0' আবিষ্কার প্রসঙ্গে আমেরিকার অধ্যাপক হ্যালস্টেড বলেন, 'অংকশাস্ত্রের অন্য কোন আবিষ্কার মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার বিকাশের পথে এতটা প্রভাব বিস্তার করেনি'।

এটা দেখা যায় যে ব্রহ্মগুপ্ত $x\div 0$ এবং $0\div x$ এই দুই ক্ষেত্রে $x/0$ এবং $0/x$ হিসেবে প্রকাশ করতে বলেন কিন্তু এর দ্বারা তিনি সঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ সঠিক মান (value) জানতেন না, তবে তিনি যেভাবে এগুলোকে প্রকাশ করে গেছেন তা থেকে মনে হয় তিনি শূণ্যকে একটি অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ (Infinitesimal) বলে মনে করতেন। এই ধারণা ভাস্করাচার্যের লেখাতে আরও স্পষ্ট হয়। তিনি তাঁর Calculus বিভাগে ব্যবহার করেন এমন সব ক্ষুদ্র রাশি যা অগ্রসর হয় শূণ্যের অত্যন্ত কাছাকাছি এবং সফল হন কিছু নির্দিষ্ট function-এর Differential Coefficient বের করতে। তিনি x এর δx পরিবর্তনের জন্য $f(x)$ function-এর $f'(x)\times\delta x$ বৃদ্ধি ব্যবহার করেন।

সেসময়ে ভাস্করাচার্য, গণেশ (গণিতজ্ঞ), প্রভৃতিদের লেখায় Infinity-র ধারণাও পাওয়া যায়।

$\frac{0}{0}=0$ এই ভুল ধারণাটি ব্রহ্মগুপ্ত দেন। ভাস্করাচার্য সঠিক করতে গিয়ে বলেন, $\lim_{t\to 0}\frac{a.t}{t}=a.$

তিনি তিনটি উদাহরণ দেন : (1) Evaluate $\frac{\left(x\times 0+\frac{x\times 0}{2}\right)}{0}=63$ এর থেকে তিনি বের করেন যে $x=14$

যা কিনা ঠিক হয় $0 = t$ (যা কিনা শূন্যের অত্যন্ত নিকটবর্তী) ধরলে।

(2) $\left\{\left(\frac{x}{0}+x-9\right)^2+\left(\frac{x}{0}+x-9\right)\right\}0=90$

তিনি উত্তর বের করেন $x=9$.

এবং (3) $\left\{\left(x+\frac{x}{2}\right)\times 0\right\}^2+2\left\{\left(x+\frac{x}{2}\right)\times 0\right\}-0=15$

উত্তর $x=2$.

এছাড়াও তিনি বলেন $\frac{a}{0}\times 0=a$ যদিও তা ঠিক নয় কারণ এটি অনির্ণেয়। যাই হোক অত শত বছর আগে $\frac{0}{0}$ -র মান বের করার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অভিনন্দন যোগ্য যেখানে এ ধরনের ভুল ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে দেখা গেছে।

হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই 'ছন্দ গণিত' (Permutation & Combination) এবং শ্রেণী ব্যবহার (Arithmetical & Geometical Progression) জানত। আর্যভট্টের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে জানা যায়।

ঠিক সময় ধর্মকার্য করার জন্য হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা শুরু করে। গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ না করলে জ্যোতিষ চর্চা করা সম্ভব নয়। তাই ভাস্করাচার্য তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থে বলেছেন যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত—এই দুপ্রকার গণিতে ব্যুৎপত্তি লাভ না করলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করার উপযুক্ত নয়। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্যের জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে গণিতের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'আর্যভট্টতন্ত্র'ই প্রাচীনতম। পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে মাত্র ২৩ বছর বয়সে কুসুমপুর বা পাটনায় আর্যভট্ট এই গ্রন্থ রচনা করেন।

'আরবরা হিন্দুদের কাছ থেকে যে শুধু বীজগণিতের মূল পেয়েছিল তাই নয় তার গণনান্তক ও দশ ধরে গণনা পদ্ধতিও হিন্দুদের কাছ থেকেই পায়।'—মনিয়ার উইলিয়ামস্। ডাক্তার বিভূতিভূষণ দত্তের মতে আধুনিক বীজগণিতের আকার ও ভাব মূলতঃ হিন্দুদের। ঋণাত্মক সংখ্যা প্রয়োগের জন্য জগৎ হিন্দুদের কাছে ঋণী। অন্যান্য হিন্দু গণিতজ্ঞদের চেষ্টায় ইউরোপের বহু পূর্বেই ভারতে সাধারণ সমীকরণের সমাধান আবিষ্কৃত হয়। ভাস্করাচার্য অনিশ্চিত বর্গ সমীকরণেরও সাধারণ সমাধান আবিষ্কার করেন। এ বিষয়ে অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা 'ক্যাজোরি' লিখেছেন—'অনিশ্চিত সমীকরণবিদ্যায় হিন্দুরা বেশ একটা সহজ ভাব দেখিয়েছেন। অঙ্কশাস্ত্রের এই সূক্ষ্ম বিভাগে সাধারণ আবিষ্কারের গৌরব হিন্দুদেরই'। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, পদ্মনাভ ও ভাস্করাচার্য বীজগণিতে এমন সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন যা ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

খুব প্রাচীন কাল থেকে ভারতে জ্যামিতির চর্চা আরম্ভ হয়। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের বেদীর গড়ন প্রণালী স্থির করা থেকে জ্যামিতির উৎপত্তি। পরবর্তী যুগে অবশ্য গ্রীকরা হিন্দুদের থেকে অনেক উন্নতি লাভ করে। কিন্তু 'এটা ভুলতে পারা যায় না যে জগৎ জ্যামিতির প্রথম শিক্ষার জন্য ভারতের কাছেই ঋণী, গ্রীসের কাছে নয়।' —রমেশচন্দ্র দত্ত। পুস্তক হিসেবে 'বৌধায়ন ও আপস্তম্ভ'র 'শুল্বসূত্র'র, (খ্রীঃ পূঃ ৮০০) নাম করা যেতে পারে। 'সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান'—এই উপপাদ্যের সঙ্গে গ্রীকদেশীয় জ্যামিতিবিদ পিথাগোরাসের নাম যুক্ত হলেও বৌধায়নে আছে "সমচতুরস্রস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুর্দ্বির্স্তাবতীং ভূমিং করোতি"—সমচতুষ্কোণের (সমচতুষ্কোণ—যার চারটি কোণ ও চারটি বাহু সমান অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র) কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ঐ চতুষ্কোণের দ্বিগুণ ও দীর্ঘচতুষ্কোণের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র চতুষ্কোণের পাশের ও নীচের দুই বাহুর উপর অঙ্কিত দুটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান। বৌধায়ন পিথাগোরাসের বহু পূর্বে জন্মান—অতএব এই আবিষ্কারের

গৌরব ও সম্মান বৌধায়নেরই প্রাপ্য। যদিও আমাদের এই গৌরব এবং আমাদের দেশের প্রাচীন এই গণিতজ্ঞদের সম্মান প্রাপ্তি বিষয়ে আমরা—ভারতবাসীরাও, সচেতন কিম্বা অবহিত নই। 'শুল্বসূত্র' হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের ধর্ম-কার্যের অংশবিশেষ। কেউ কেউ বলেন হিন্দু জ্যামিতি গ্রীকদের থেকে ধার করা। কিন্তু হিন্দুরা তাদের ধর্মপুস্তকে অত প্রাচীনকালে অন্য দেশের মত এনে নিজেদের নামে বেমালুম চালিয়ে দিয়েছে—একথা হিন্দু চরিত্র প্রকৃতি বিচার করলে কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পৃথিবীর আবর্তনের জন্য দিবা রাত্রির ভেদ হয়—এই তত্ত্ব আর্যভট্ট প্রথম আবিষ্কার করেন। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান বর্গক্ষেত্র, একটি বর্গক্ষেত্রের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা অর্ধেক কিম্বা সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কন প্রভৃতি বিষয় শুল্বসূত্রে আছে। বৌধায়ন বা আপস্তম্ভের মতে সমচতুর্ভুজের বাহুর মান ১ হলে কর্ণের মান $১+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩\times৪}+\frac{১}{৩\times৪\times৩৪}$ অর্থাৎ ১·৪১৪২৫৬ হয়। আধুনিক মতে $\sqrt{২}$ বা ১·৪১৪২১৩ ··· অর্থাৎ পঞ্চম দশমিক স্থান পর্যন্ত মিল আছে। আর্যভট্ট পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত দিয়েছেন $\frac{২২}{৭}$। ভাস্করাচার্যের মতে $\frac{২২}{৭}$ দিয়ে ব্যাসকে গুণ করলে স্থূল (পরিধি) এবং $\frac{৩৯২৭}{১২৫০}$ দিয়ে গুণ করলে নিকট পরিধি পাওয়া যায়। $\frac{৩৯২৭}{১২৫০}$ বা $৩\frac{১৭৭}{১২৫০}$ বা ৩ ১৪১৬ প্রায় আধুনিক গণনার (৩·১৪১৫৯) কাছাকাছি। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তিনবাহু দিয়ে বের করার পদ্ধতি ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে ক্লৌভিয়াস আবিষ্কার করেন যা ভারতে প্রায় ৩০০ খ্রীঃ 'সূর্য-সিদ্ধান্তে' লেখা আছে। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য চার বাহু থেকে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বের করার প্রণালী বের করেন।

ত্রিকোণোমিতিতেও হিন্দুদের দান যথেষ্ট। এলফিনস্টোন তাঁর 'ভারত ইতিহাস'-এ লেখেন, 'সূর্য-সিদ্ধান্তে ত্রিকোণোমিতির এমন পদ্ধতি আছে যা ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর আগে আবিষ্কৃত হয় নি। অধ্যাপক ওয়ালস বলেছেন, 'একটি পুস্তক যত প্রাচীনই হোক তাতে যদি ত্রিকোণোমিতি পাওয়া যায়, তবে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি যে ঐ পুস্তক বিজ্ঞানের শৈশবে লেখা হয় নি। কাজেই সূর্য সিদ্ধান্তের বহু পূর্বেই ভারতে জ্যামিতি চর্চা শুরু হয়। হিন্দুরা জ্যা (sine), কোটি জ্যা (co-sine), উৎক্রম জ্যা (versed sine) আবিষ্কার করে এবং তারা অনেক সূত্র জানত। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি পুস্তকে sine, cosine, versed sine-এর সারণী আছে। সূর্য সিদ্ধান্তের সারণীতে এমন পদ্ধতি আছে যা ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রিগস্ পুনরায় আবিষ্কার করেন। ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী'তে একটি বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ,………অষ্টভূজ, নবভূজের বাহুর পরিমাণ বৃত্তের ব্যাসের হিসাবে বের করার প্রণালী আছে যার সঙ্গে আধুনিক ফল তুলনা করলে অবাক হতে হয়।

আধুনিক হিসাব :		প্রাচীন ভারতীয় হিসাব :
ত্রিভুজের বাহু	= ব্যাস × ·৮৬৬০২৫৪	ব্যাস × ·৮৬৬০২৫
চতুর্ভুজের বাহু	= " × ·৭০৭১০৬৭	" × ·৭০৭১০৮৩
… … …	… … … … … …	… … … … … …. ….
নবভুজের বাহু	= " × ·৩৪২০২০১	" × ·৩৪১৯২৫

১৮৫৮ খ্রীঃ বাপুদেব শাস্ত্রী সভ্য জগতের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করেন যে ভাস্করাচার্য নিউটন, লাইবনিটসের ৫০০ বছরেরও আগে Differential Calculus আবিষ্কার করেন। ভাস্করাচার্য দৈনিক গতি বের করার

জন্য যে প্রণালী উদ্ভাবন করেন তার নাম তাৎকালিক প্রণালী যা কিনা Differential Calculus ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে Differential Calculus-এর আবিষ্কারক হিসেবে নিউটনের পূর্ববর্তী বলে ভাস্করাচার্যের দাবী সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে হিন্দুরা উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। আজ চন্দ্র আকাশে যেখানে আছে, ২৭।২৮ দিন পর আবার সে জায়গায় ফিরে আসবে এবং চন্দ্র যে সূর্যালোকেই আলোকিত একথা বৈদিক ঋষিরা জানতেন। চন্দ্রের ভগ্ন ভোগকাল সূর্য সিদ্ধান্ত মতে ২৭·৩২১৬৭ দিন আর আধুনিক মতে ২৭·৩২১৬৬ দিন। সূক্ষ্ম গণনার পরিচয় এর থেকে আর কি বেশী হতে পারে। তিলকের মতে তারা মঙ্গল, বুধ, বৃহঃ, শুক্র, শনি—এই পাঁচটি গ্রহকে চিনতেন। হিন্দু জ্যোতিষীদের মধ্যে আর্যভট্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর আবর্তনের জন্যই যে দিবারাত্রির ভেদ হয় আর্যভট্টই প্রথম সে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এছাড়া সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সঠিক কারণ তিনি বের করেন।

অবশেষে আর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কারের উল্লেখ করব। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক বলে নিউটন জগদ্বিখ্যাত। তিনি এই শক্তিকে অঙ্কশাস্ত্রের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণে যে ভারী বস্তু সকল উপর থেকে পৃথিবীতে পড়ে তা হিন্দু গণিতাকাশের ভাস্করসম গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'তে স্পষ্ট আছে।

"আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
মস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি।
সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়াং মে।"

অর্থাৎ আকর্ষণ শক্তিসম্পন্না পৃথিবী যখন আকাশস্থ গুরু বস্তু নিজ শক্তি দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ করে তখন মনে হয় ঐ সব বস্তু পড়ছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির জোরেই পৃথিবীতে তারা আসছে। চতুর্থ লাইনের অর্থ—পৃথিবী সর্বদিকে সমান আকর্ষণে আবদ্ধ।

সমসাময়িক রাজনীতি

প্রশান্ত রায়

'পশ্চিম' বলতে আমরা যে রাজনৈতিক সত্তাকে সাধারণত বুঝি, সেখানে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি নিয়ে এক ধরনের চিন্তা ও কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকারী সিদ্ধান্ত আমরা লক্ষ্য করছি। প্রবণতাটা রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ক্রমাগত কমানোর দিকে। প্রধান পদ্ধতি হ'লো রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন—ভোগ্যদ্রব্যের অথবা সেবার—ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্ত হিসেবে ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রাইভেটাইসেসান্ বা ব্যক্তি মালিকানায় রূপান্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ কল্যাণকর রাষ্ট্রদর্শন ও কর্মসূচী পরিত্যক্ত হবার পথে। এ পরিবর্তন ধনতন্ত্রের বিবর্তনের আরেকটা ধাপ, ভেবে নেওয়া যেতে পারে। কতো দীর্ঘস্থায়ী এ পরিবর্তন হবে, সে অনুমানের চেষ্টা না করে, বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করেই রাষ্ট্রযন্ত্রের কার্য সঙ্কোচন ও রাষ্ট্রশক্তির প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন করার চেষ্টা চলছে। সমতুল্য প্রক্রিয়া সমাজতান্ত্রিক 'পূর্বে'ও শুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য যে পরিপ্রেক্ষিত ও পদ্ধতির পার্থক্য আছে। তাত্ত্বিক মাত্রায় হ্রস্বীকৃত রাষ্ট্র নিয়ে বুদ্ধিজীবি মহলেও ভাবনা-চিন্তা চলছে।

মিনিম্যাল স্টেট্ বা হ্রস্বীকৃত রাষ্ট্র স্বীকৃতির একটা ফলাফল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতির অবক্ষয়। যেহেতু রাষ্ট্র একই সঙ্গে রাজনীতির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, প্রধান ক্ষেত্রও স্থিতিমান, রাষ্ট্রকে হ্রাস করার তাৎপর্য রাজনীতির হ্রাস পাওয়া। ফলা ফলটা তাৎক্ষনিক না হলেও। রাজনীতির হ্রাস, অনেকের বিচারেই মূল্যগ্রাহ্য। বিশেষত যারা ভাবতত্ত্ববিরোধী বাস্তবধর্মিতায় বিশ্বাসী, তাদের। আবার এদের অনেকেই মতাদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের কর্ণধার। সাধারণ মানুষের চেতনার পরিবর্তন, পরিবর্তিত চেতনাকে হাতিয়ার করে শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা—এ সব কথা আর বেশী কেউ বলে না। (সেই তৃতীয় বিশ্বেও নয়, যেখানে শোষণের প্রাক-ধনতান্ত্রিক কাঠামো এখনও সবল। যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ধনতান্ত্রিক ও নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ কাঠামো)। প্রযুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পাচ্ছে। আপেক্ষিক গুরুত্বের তারতম্যে, অনুভূতি, বোধ ও বিশ্বাসের জায়গায় যুক্তি, বুদ্ধি ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার অভিজ্ঞতা। রাজনীতি আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে। কমপক্ষে প্রধান স্বাভাবিক ক্ষেত্র হিসেবে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে অনেকটা হারাতে বসেছে। রাষ্ট্রক্ষমতার দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়, তারও অবক্ষয় অনেকের কাছে কাম্য বলে মনে হচ্ছে। তারা অবশ্যই প্রচলিত অর্থে স্বার্থগোষ্ঠীর সদস্য / সমর্থকরা নয়। (রাষ্ট্রের সঙ্কোচন ও রাজনৈতিক দলের আকাঙ্খিত গুরুত্ব হ্রাসে, তাদের অসুবিধাই বেশী)। এরা মূলতঃ আদর্শ-স্বার্থ বোধ তৈরীর জন্য নতুন জনগোষ্ঠীর সদস্য / সমর্থক। এদের মূলমন্ত্র : পিউপল ফার্স্ট। জনস্বার্থই প্রধান। তা হতে পারে : অস্ত্রযুক্ত পৃথিবী, নারী-মুক্তি, শিশুকল্যাণ, সবাইকার জন্য খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-বাসস্থান, পরিবেশ রক্ষা, অবলুপ্তপ্রায় পশু-পক্ষী-পতঙ্গের সুরক্ষা। রাজনীতির মূল প্রক্রিয়াগুলো এখানে অনুপস্থিত নয়। এখানেও আবেদন, বিতর্ক, আন্দোলন আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হবার প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত কাঠামোকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। এ ধরণের গোষ্ঠীর কর্মপরিধি অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে। সদস্যপদ, সমর্থনও। এ এক অন্য পর্যায়ের জননীতি, যার উচ্চারিত উদ্দেশ্য জনস্বার্থকে রাজনীতিযুক্ত করা। ডিপলিটিসাইসেসন্।

রাষ্ট্রভিত্তিক জনজীবনে এ ধরণের ঘটনার পাশাপাশি আরেক ঘটনা ঘটছে। ঐ 'পশ্চিমেই' তার সূত্রপাত। যে সম্পর্ক নিতান্তই সামাজিক বলে পরিচিত ছিল, সেখানেও "রাজনীতির" প্রকাশ কেউ কেউ খুঁজে পাচ্ছেন।

এরা মূলতঃ বুদ্ধিজীবি, অনেক সময় প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্দোলনের সমর্থক। তবে এদের বক্তব্যের অনুস্রাবণও শুরু হয়েছে। এ 'রাজনীতি'তে, বলাই বাহুল্য, রাজা বা সমতুল্য কেউ নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রশক্তি প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক নয়। "রাজনীতি"র 'রাজ' কর্তৃত্ব—অবদমন ও স্বন্দেবর প্রতীক মাত্র। সাধারণভাবে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কে রাজনীতির চেহারা ধরা পড়ছে। নির্দিষ্ট উদাহরণ হিসেবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বা বয়স্ক-কনিষ্ঠের সম্পর্ক উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যক্তি সম্পর্কে রাজনীতি খুঁজে পান দু' শ্রেণীর মানুষ। এক ঃ যারা বাস্তব বিশ্লেষণের খাতিরে বুদ্ধির প্রয়োগে সামাজিক সম্পর্ক থেকে মানসিক ভাবে দূরে সরে যেতে পারেন। এরা বুদ্ধিজীবি, সমাজতত্ত্ববিদ বা মনস্তাত্ত্বিক। এ সম্পর্কে তারা ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত নাও থাকতে পারেন। দুই ঃ তুলনামূলকভাবে সাধারণ মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির স্তরের। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সম্পর্কের পারিবারিক-গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের ধারার সচেতন বিচার বা স্বতঃস্ফূর্ত বোধ থেকে এরা সম্পর্কের চলে আসা বিন্যাসে 'রাজনীতি'র সন্ধান পান। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের বিশ্লেষণের অভিধান দুর্বল হতে পারে, তার জন্য এ 'রাজনীতি'র পরিপূর্ণ জ্ঞানও। আবার এ 'রাজনীতির' প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রথম শ্রেণীর মানুষের নাও থাকতে পারে। তাই তাঁদের স্বত্তা নির্ভর জ্ঞানের গভীরত্ব নাও থাকতে পারে। কিন্তু দু' শ্রেণীর মানুষই সম্পর্কের প্রচলিত বিন্যাসে ব্যক্তি-নির্দিষ্ট অনুভূতির অভাব, কর্তৃত্ব, শাস্তি, শোষণ ও পরিবর্তন-বিরোধীতার সমালোচক। এ সমালোচকরা, অভাবী ও অবদমিতের পক্ষে। বলাই বাহুল্য, এরা সম্পর্কের বিরোধী নন। এরা সম্পর্কের বিন্যাসে সহজাত সাম্যবোধ চান। প্রথামুক্ত, পারস্পরিক অনুভূতি নির্ভর, স্বাধীন সম্পর্কে এরা আগ্রহী। সম্পর্ক সম্বন্ধে এ এক ভিন্ন মূল্যবোধ। এরা অনুস্রাবণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত 'রাজনীতি'র বিকল্প খুঁজছেন। এতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যক্তি সম্পর্কের রাজনীতিকরণ হচ্ছে। পলিটিসাইসেসন্।

এ দুই আপাতভিন্ন সমসাময়িক ঘটনার—যৌথ আচরণের ক্ষেত্রে ও চিন্তার মাত্রায়—পেছনে আছে গুণবিন্যাসের মানসিকতা। সভ্যতার কাছে শেখা, সভ্যতার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা। কোথায় একটা অস্বস্তি, অসুখের অভিজ্ঞতা প্ররোচনা দেয়। আধুনিক সম্ভাবনা বোধ, বিশ্বাস যোগায়। ইতিহাস বিচার, নির্দেশ দেয়। এ দুটো ঘটনার পেছনেই, নতুন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও স্বাধীনতার আদর্শ কাজ করছে। মুক্তি চাওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের সামূহিকতাবাদ ও সমাজ কল্যাণমনস্কতা আশ্রয় করা রাষ্ট্রনীতি থেকে। মুক্তি চাওয়া হচ্ছে পুরুষ ও বয়স্কশাসিত সম্পর্কের বিন্যাস থেকে। মুক্তি চাওয়া হচ্ছে, প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে প্রকৃতির ক্রম-ব্যবহারই প্রগতির একমাত্র সূচক, এই সংস্কৃতি থেকে।

হোমিও বিতর্ক

সুদীপ্ত সরস্বতী

কয়েক বছরের পুরোনো একটা হিসেব অনুযায়ী, এদেশে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়া ডাক্তারের (চলতি কথায় 'অ্যালোপ্যাথে'র) সংখ্যা ২·৭ লক্ষ, কবিরাজের সংখ্যা ২·৪ লক্ষ, হোমিওপ্যাথের সংখ্যা ১·১২ লক্ষ, উনানি ২৯ হাজার আর সিদ্ধ ১৮ হাজার।[১] তার মানে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির পাশাপাশি যেসব বিকল্প চিকিৎসা-পদ্ধতি মানুষকে টানছে, তাদের মধ্যে হোমিওপ্যাথি অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। অবশ্য এসব হিসেবনিকেশ ভুলে গেলেও হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তার কথায় বোধহয় আমাদের সবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সায় দেবে।

যারা হোমিওপ্যাথিকে ডাহা অবৈজ্ঞানিক বলে কফির প্রথম চুমুকেই উড়িয়ে দিতে চান, তাদের বক্তব্য : প্রায়ই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়ায় মূল উপাদানের দ্রবণকে ক্রমশ লঘু (dilute) করতে করতে এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে তাতে আর এক অণুও দ্রবীভূত পদার্থ থাকার কথা নয়—বঙ্গোপসাগরের জলে কয়েক চামচ চিনি মেশানোর *সঙ্গে ব্যাপারটা তুলনীয়।....তো যাতে রোগ সারানোর পদার্থটাই উধাও, তার আবার রোগ সারানোর* ক্ষমতা থাকে কি ক'রে ?···যত্তোসব··· ।

এর উত্তরে হোমিওপ্যাথির বেশ কিছু সমর্থক তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণের মতো আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সূত্রটি উচ্চারণ ক'রে বলেন : হায়ার ডাইলিউশনে ম্যাস (mass/ভর) এনার্জিতে কনভার্টেড হয়। ....অর্থাৎ....থাকে, থাকে, জানতি পারো না।

খবরের কাগজে বা জনপ্রিয় পত্রপত্রিকায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কাজ করার সপক্ষে নানান "বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে"র দাবি শোনা যায়। যেমন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ থেকে আনিসুর রহমান খুদাবক্স একবার লিখেছিলেন[২] : "আমি এবং কতিপয় ছাত্রছাত্রী একটা ছোট্ট পরীক্ষা করি। বর্তমানে পরীক্ষালব্ধ *ফলের ভিত্তিতে গবেষণাপত্রটি কোনও একটি আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রস্তুতির পথে,* তাই হুবহু data তুলে দেওয়ায় বাধা আছে। · অনেকগুলো ইঁদুরকে X-ray দেওয়া হয় এবং (তাদের এক অংশকে) হোমিওপ্যাথি Arnica Mont. 30 মাত্রার ওষুধ খাওয়ানো হয়। তাদের অস্থিমজ্জা (Bone marrow) থেকে ক্রোমোসোমের পরিবর্তন (aberration) পর্যবেক্ষণ করা হয়।···আমাদের পরীক্ষায় আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে গেছি এটা দেখে যে ঐ সামান্য মাত্রার Arnica প্রায় 15-25% aberrations protect করে! এবং শুধু Arnica প্রয়োগ করে mutagenic effect ক্রোমোসোমের উপর পড়ে না।....বস্তুতপক্ষে এত কম মাত্রার ওষুধে এত বেশি মাত্রার protection পাওয়া সত্যিই একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা এবং আমরা আশা করি আমাদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হলে বিশ্ববিজ্ঞানে একটি নতুন দিকের সূচনা হবে। আমরা স্বীকার করছি এই protection-এর পিছনে সঠিক mechanism এর ব্যাখ্যা আমাদেরও জানা নেই।"

আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানপত্রিকায় এ ধরনের দাবিগুলো প্রকাশিত হওয়ার খবর অবশ্য কোনোদিনই জানা যায় না।

হোমিওপ্যাথির অনেক সমর্থক বলেন : বেশ তো, ডাইলিউশনের তত্ত্ব না হয় না মানলেন। কিন্তু এত রোগী যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ভালো হচ্ছে ?

হোমিওপ্যাথির অনেক অবিশ্বাসী উত্তরে বলেন : বিপুলসংখ্যক লোক সাইকোসোম্যাটিক ডিজিজে ভোগে। হোমিওপ্যাথের কাছে বিশ্বাস আর ভরসা নিয়ে গেলে তাদের বেশির ভাগেরই রোগের উপশম হয়। এতে

হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণিত হয় না বরং আশ্বাস-বিশ্বাসে সাইকোসোম্যাটিক রোগ আরোগ্যের তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেক হোমিওবিরোধী বলেন: বহু রোগই তো সেলফ লিমিটিং (self-limiting) অর্থাৎ কোনো চিকিৎসা না করলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই ভালো হয়ে যায়। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ না খেলেও এরকম রোগীর রোগ সেরে যেত। আসলে কথায় বলে না, ঝড়ে বক মরে।

অনেকে আবার বেশ বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ভাব নিয়ে বলেন: কোনো রোগে কোনো রাসায়নিক পদার্থ সত্যিই ওষুধের কাজ করে কিনা, তা জানার বৈজ্ঞানিক উপায় হোলো ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড এক্সপেরিমেন্ট চালানো। দেখি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল?

বছর পাঁচেক আগেও হোমিওপ্যাথির সমর্থককে একথায় কাত হতে হোতো। কিন্তু অবস্থাটা এখন আর সেরকম নেই। ১৯৮৬তে আন্তর্জাতিক মানের মেডিক্যাল জার্নাল "ল্যানসেটে" একটি চাঞ্চল্যকর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।[৩] এতে একদল বিজ্ঞানী (রেইলি ও তাঁর সহযোগীরা) একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, যাতে মূল "ওষুধে"র কোনো অণুই থাকবার কথা নয়, তা নিয়ে ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে ওষুধের কার্যকারিতা পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন।

তবে "ল্যানসেটে"র গবেষণাপত্রটি প্রসঙ্গে ভিটামিন সি ও সর্দির কথা মনে পড়ে। ভিটামিন সি সর্দি সারানোর ওষুধ কিনা সেকথা জানার জন্যে বহু ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়েছে। বেশ কয়েকটাতে সর্দি সারাতে ভিটামিন সি-র কার্যকারিতা (efficacy) আছে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বেশির ভাগ পরীক্ষাতেই সর্দি আর ভিটামিন সি-র কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়নি।[৪]

১৯৬০-এ প্রথম ভিটামিন সি ও সর্দির সম্পর্কের দাবি করা হয়। এটা ১৯৯০। এই তিরিশ বছরে বহু ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড এক্সপেরিমেন্ট করা সত্ত্বেও ভিটামিন সি সর্দিতে ওষুধের কাজ করে কি না সে বিষয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। তাই বলছি, একটামাত্র ডাবল ব্লাইন্ড কনট্রোল্ড এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল থেকেই একথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা ঘটনা।

এরমধ্যে ১৯৮৮-তে আবার প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান পত্রিকা "নেচারে" প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে (লেখক: বেনভেনিস্তে ও তাঁর সহযোগীরা) চমকে দেওয়ার মতো একটি দাবি করা হয়েছে।[৫] দাবির মূল বক্তব্য: একটি দ্রবণকে ক্রমশ লঘু করতে করতে যখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে তাতে দ্রবীভূত সক্রিয় পদার্থের একটি অণুও থাকার কথা নয়, তখন কিছু বিক্রিয়ায় ঐ দ্রবীভূত পদার্থের জোরালো সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে।

দাবি করা পর্যবেক্ষণটি সত্যি হলে শুধু যে এতদিন ধরে চলে আসা এবং অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে পরীক্ষিত অনেকগুলো গোড়ার ধারনা পুরোপুরি বাতিল করতে বা বদলাতে হবে তা'ই নয়, হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব ও চর্চাও একটি পরীক্ষাগত ভিত্তি খুঁজে পাবে।

কিন্তু বেনভেনিস্তেদের পর্যবেক্ষণটি প্রকাশিত হওয়ার পর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। পরীক্ষাটা দেখতে "নেচারে"র তরফ থেকে একটি পর্যবেক্ষকদল মূল ল্যাবরেটরিতে যায়। ঐ পর্যবেক্ষকদলের রিপোর্টে বেনভেনিস্তেদের দাবির সমর্থন মেলেনি।[৬] আলাদা ল্যাবরেটরিতে একাধিক বিজ্ঞানী একই ধরণের পরীক্ষা চালিয়ে প্রত্যাশিত ফলাফল পাননি।[৭] বেনভেনিস্তেদের ফলাফল প্রকাশের পরে কোনো গবেষক তাঁদের মতো ফল পাচ্ছেন এমন দাবি করেননি। যতদিন না পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে আলাদা আলাদা বহু গবেষকদল ঐ ধরণের পরীক্ষা চালিয়ে বার বার বেনভেনিস্তেদের মতো ফলাফল পাচ্ছেন এবং সেটা যে কোনো কৃত্রিম ঘটনার (artifact) জন্যে নয় তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে ততদিন হোমিওপ্যাথির তাত্ত্বিক ভিত্তিকে (অর্থাৎ পদার্থের অণুর অস্তিত্ব না থাকলেও তার কার্যকারিতা থাকতে পারে)—বিশ্বাস করার কোনো কারণ ঘটছে না।

এতক্ষণ যেসব কথাবার্তা হোলো, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের তত্ত্ব এবং কার্যকারিতা (efficacy)—এদের কোনোটাই আজ অবধি বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে অবৈজ্ঞানিক মানেই সম্পূর্ণ বর্জনীয় নয়। শুধু ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেই হোমিওপ্যাথির রমরমা নয়। হোমিওপ্যাথি জনপ্রিয় ফ্রান্সেও। প্রতি চারজন ফরাসী ডাক্তারদের একজন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন।[৮] "হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কাজ করে"—বহুসংখ্যক মানুষ এই অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস পোষণ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথির প্রয়োগ কি সমর্থন করা যায়? . সত্যি বলতে কি, হোমিওপ্যাথি নিয়ে বহুসংখ্যক মানুষের আগ্রহ ও বিশ্বাস যত ব্যাপক, এ বিষয়ে মজবুত বা আটঘাট বাঁধা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঠিক ততটাই অভাব। তাই স্বীকার করা দরকার, হোমিওপ্যাথি সত্যিই কাজ করে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। এটা একটা খোলা প্রশ্ন (open question)। সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা ব্যাপকভাবে চালানো উচিত। হোমিওপ্যাথির ভেতর যদি গ্রহণযোগ্য উপাদান থাকে, তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাকে সনাক্ত ক'রে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আওতায় আনার প্রক্রিয়াকে যত ত্বরান্বিত করা যায় ততই মঙ্গল।

সূত্র : ১. হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (১৯৮৪), পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা,
—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও সম্পাদকমণ্ডলীর লেখা

২. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, মে-জুন ১৯৮২

৩. Lancet ii, 881—886, 1986

৪. Goodman and Gillman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 7th ed. 1985

৫. Nature, 333, 816-818 ; June 30, 1988

৬. Nature, 334, 287-291 ; July 28, 1988

৭. Nature, 334. 375 ; August 4, 1988
Nature 334, 559 ; August 18, 1988

৮. Nature, 334, 367 ; August 4, 1988

৯. বিজ্ঞান, বিজ্ঞানকর্মীতে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর 1988) প্রকাশিত নিচের লেখাগুলো :
(১) লঘু দ্রবণের জোরালো ক্ষমতা (সম্পাদকীয়)
(২) একটি বিতর্কিত (অ-) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—গৌতম ব্যানার্জি
(৩) হোমিওপ্যাথির পরীক্ষামূলক ভিত্তি : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক—সুদীপ্ত সরস্বতী
(৪) হোমিওপ্যাথি বিতর্ক : দ্বিতীয় পর্যায় : নেচারের আত্মবিশ্লেষণ—সুদীপ্ত সরস্বতী

ক্রীড়াভূমি

অমিতেন্দু পালিত

॥ ১ ॥

গতকাল না হয়ে ঘটনাটা আজও ঘটতে পারত। বা আগামীকাল। অথবা একমাস আগে বা পরে। আসলে ঘটনাটা অবধারিত ছিল। শুরুতেই বোঝা গিয়েছিল শেষ আসবেই। সুতরাং সময়ের নিরিখে কোনো-রকম পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল না। ফুসফুস থেকে সংক্রমণ ক্রমশ পাকস্থলীতে সঞ্চারিত হত, সেখান থেকে অন্যান্য আর যেসব জায়গায় যাওয়া প্রয়োজন। সুষ্ঠুভাবে, পরিকল্পনামাফিক এক একটা অঞ্চল অতিক্রম করে সবশেষে হাড়-পাঁজরা ওঠানামা করানোর যন্ত্রটায় চাবি ঘুরিয়ে দেওয়া। গোটা পরিকল্পনাটায় কোনো খুঁত ছিল না, অর্থাৎ অসিত মরতই।

সেক্ষেত্রে মনোরঞ্জনের করণীয় কি ছিল? আঙুলের গাঁট ঠুকে ঠুকে হিসেব করল সে, কি কি করা যেত, কি কি করা হয়েছে এবং হয়নি। শারীরিক অস্বস্তি অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে যোগাযোগ করা, তারপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, আর্থিক উপার্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যথাসম্ভব ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং গত প্রায় আট মাস (যতদিন অসিত হাসপাতালে ছিল) প্রতিদিন খোঁজখবর নেওয়া, খুঁটিনাটি ব্যবস্থার প্রতি নজর রাখা এবং অসিতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করা। হ্যাঁ, এগুলোর সবকটাই সে করেছে এবং যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই করেছে, পিতার জন্য পুত্রের যেভাবে করা উচিত। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে তার কর্তব্যে গাফিলতি হয়েছে।

তবু একটা বিরক্তিকর অস্বস্তি খোঁচা দিচ্ছিল তাকে। আরো কিছুক্ষণ হিসেব নিকেশের পর কারণটা আন্দাজ করল মনোরঞ্জন। গুরুতর গোলমাল রয়ে গেছে একটা। একবিন্দুও শোক বা দুঃখের অনুভূতি তার নেই।

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে সত্যিই আশ্চর্য। পিতার মৃত্যুতে একমাত্র পুত্রের কোনো দুঃখজনক অনুভূতি নেই, এরকম অন্য কোনো ক্ষেত্রে শুনেছে বলে মনে পড়ছে না। বস্তুতপক্ষে অসিতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল একেবারেই ঠিকঠাক, যেরকম থাকা উচিত। অসিতের অসুস্থ হওয়া থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত মনোরঞ্জনের ভূমিকায় কোনো ভুল ত্রুটি নেই। তাহলে উত্তরটা মিলছে না কেন?

হাওড়া ব্রীজের রেলিংয়ে কনুইয়ের ভার ছেড়ে দিয়ে এইসব ভাবছিল সে। সময়টা শীত আর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি যখন দুই ঋতুর মধ্যে অস্তিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কিছুক্ষণ আগে অবধি শরীরে জন্ম নিচ্ছিল অসংখ্য স্যাঁতস্যাঁতে ঘামের বিন্দু, আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই জলজ অনুভূতি ছাপিয়ে প্রগাঢ় হয়ে উঠছে দমকা হাওয়ার স্পর্শ। নিচে জলের উপর নৌকোগুলো একটু পরেই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখন নদীটাকে মনে হচ্ছে বৃহৎ এক ফালি তামাটে বর্ণের চাদর, মাঝে মাঝে রঙ ওঠা তাপ্পির মতন মাথা তুলছে নোঙরগুলো।

এখন পর্যন্ত সবকিছু অর্থাৎ মনোরঞ্জনের চিন্তাভাবনা, হাওড়া ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে নিম্নে প্রবাহিত গঙ্গার সান্নিধ্যে এবং তাও এহেন চিন্তাভাবনা বেশ বিসদৃশ অন্তত মনোরঞ্জনের যারা পরিচিত তাদের কাছে তো বটেই। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে মনোরঞ্জন চিন্তাশীল নয়। কিন্তু সচরাচর তার চিন্তা যে সমস্ত বিষয়ে

কেন্দ্রীভূত হয় এবং যে ধরনের পরিস্থিতিতে সে নিজস্ব প্রকারে চিন্তাশীল হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষিত, পটভূমি এবং ভাবনার যথেষ্টই বেমিল।

চিন্তাভাবনায় ছেদ টেনে পা বাড়াল মনোরঞ্জন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রায় চমকেই উঠল সে, ছ'টা বাজতে চলল। গোটা দিনটা কাটল অস্বস্তির রেশ নিয়ে খাপছাড়া ভাবে। সকাল দশটায় অফিসে ঢুকে নির্দিষ্ট টেবিলে যখন সে বসে, তখনো আন্দাজ করতে পারেনি, দিনটার পরিণতি অন্যরকম হবে। অবশ্য এখন ভেবে দেখলে মনে হচ্ছে সে সম্ভাবনা আগাগোড়াই ছিল। এমন নয় যে অফিসে কাজের চাপ ছিল না, অন্যান্য দিনের তুলনায় বরঞ্চ কিছুটা বেশিই ছিল তা। তবু শিকড়ে নাড়া দেওয়া অস্বস্তিকর অনুভূতির তাড়নায় চারটে বাজার বেশ কিছু আগেই সে বেরিয়ে পড়ে, ব্রেবোর্ন রোড আর উড়ালপুল পেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পা রাখে হাওড়া ব্রীজে। তারপর প্রায় দু'ঘন্টা ভিন্নগোত্রীয় হিসেব নিকেশে ব্যস্ত রইল সে, অন্য খাতায় অন্য কলমে। কিন্তু অংকটা বেখাপ্পা ভাবে আটকে গিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

দমবন্ধ করা বাসের ভীড়ে সে যখন কোনোমতে চার আঙুলের ফাঁসে রডের ধাতব শরীরটাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল তখন হঠাৎই তার মনে হল, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা উচিত ছিল। রমা একলা রয়েছে বাড়িতে। আত্মীয় পরিজনেরা নিশ্চয়ই আছেন, তবু বিশেষ করে তার সান্নিধ্য বোধহয় রমার এখন বেশি প্রয়োজন। গতকাল ভোররাতে অসিত মারা যাবার পর আজ এই মুহূর্ত অবধি তার এবং রমার আলাদাভাবে মিলিত হওয়ার কোনো সুযোগ হয়নি। এমন নয় যে তাদের দুজনেরই রয়েছে অপরের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কথা। সম্ভবত সেরকম কিছুর প্রয়োজনও নেই কারণ মনোরঞ্জনের হিসেব অনুযায়ী এখন সেই সময় যখন নিস্তব্ধতা ধ্বনির চেয়ে অধিক বাঙ্ময়। তবু কর্তব্যনিষ্ঠ মনোরঞ্জনের কর্মসূচীর তালিকা থেকে এই কাজটা কখন যেন মুছে গেছে, তার অপরাহ্নের বিভ্রান্তি এবং অস্বস্তির সুযোগ নিয়ে। যে অংকটা নিয়ে আজ সারাদিন ধরে ব্যস্ত মনোরঞ্জন, তার সমাধান আরেকটু দূরে গেল। নিজের অজান্তেই তার আঙুলগুলো রডের ঠান্ডা শরীরে চেপে বসে ধাতবতা শুষে নিয়ে তাকে উত্তপ্ত করার প্রয়াসে ব্যস্ত হল।

॥ ২ ॥

খবরটা পাবার পর থেকেই ভীড় জমতে শুরু করেছিল। আত্মীয়স্বজন, চেনা-পরিচিত ও প্রতিবেশীরা এসে পড়েছিল সান্ত্বনা জানাতে। ছোট বাড়িটা হঠাৎই প্রাণের উত্তাপে সজীব হয়ে উঠেছিল। অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও রমা অনুভব করতে পারছিল তা। জড়তা মেশানো বিহ্বলতার অগোচরে এগিয়ে আসছিল অনেক চেনামুখ, আকারে ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র হলেও উদ্দেশ্যে এক। ক্রমশই জটিল আবর্তের স্রোতে আবিষ্ট হয়ে পড়ছিল রমা। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল উপস্থিত অতিথিদের সামান্য মিষ্টিমুখ করার জন্য অনুরোধ করছে দাদা। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রমাও কখনো কখনো তাই করেছিল। তবু দাদার মধ্যে লক্ষ্য করেছিল যে সংযম এবং স্থিতি, নিজের মধ্যে তার কণামাত্রও খুঁজে পায়নি। নিজেকে মনে হচ্ছিল টালমাটাল, বিভ্রান্ত, শ্বাসরোধ করা কোনো অসহায়তার শিকার।

অসিত হাসপাতালে যাবার পর থেকেই রমার জীবনযাত্রায় সামান্য হলেও কিছু পরিবর্তন এসেছিল। দাদা মনোরঞ্জন বরাবরই নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে, ভীষণভাবেই অন্তর্মুখী সে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর, জলখাবার খেয়েই সে ঢুকে পড়ত নিজের ঘরে, ব্যস্ত থাকত অফিসের কাজ নয়তো নিজস্ব পড়াশোনায়। বাবা প্রায়ই বলত তারা দুই ভাই-বোন একেবারে পরস্পরবিরোধী চরিত্র। রমা প্রাণোচ্ছল বলগাহীন, তার আবেগের প্রকাশ অসংযত, জীবনপ্রাচুর্যে ভরপুর সে। ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করে বছর দেড়েক আগে প্রাইমারী স্কুল টিচারের চাকরীটা নিয়েছিল রমা, মাস্টারি করা সত্ত্বেও তার স্বাভাবিক উচ্ছলতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। চাকরি নিতে কিছুটা বাধাই হয়েছিল সে, অসিত অবসরগ্রহণ করার পর শুধু দাদার উপার্জনে সুষ্ঠুভাবে সংসার

চালানোর ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল। চাকরী নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য তাকে সেরকম কোনো আপত্তির মুখোমুখি হতে হয়নি। দাদার যে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল তা নয়, অবশ্য তা কি কারণে রমা জানে না কিন্তু অসিত আগাগোড়াই তাকে উৎসাহিত করেছিল। রমা জানত অসিত সামান্য ব্যাঙ্কের কেরানী হওয়া সত্ত্বেও ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে যথেষ্ট উচ্চাশা পোষণ করত, বিশেষ করে রমার ক্ষেত্রে, কারণ পরীক্ষার ফলাফলে দাদার তুলনায় সে অনেকটাই এগিয়ে ছিল।

দাদার অন্তর্মুখীনতার কারণে, তার যাবতীয় অবসর সময় কাটত বাবার সান্নিধ্যে। মৃত্যুর চার বছর আগে চাকরী থেকে অবসর নেয় অসিত। রমার ধারণা গত চার বছরে তাদের সম্পর্ক অনেক দৃঢ় হয়েছিল। এমন অনেক দিনই হয়েছে, লোডশেডিং চলছে, নিজের ঘরে হ্যারিকেনের আলোয় দাদা কাজে ব্যস্ত আর তাদের একতলা ভাড়াবাড়ির সামনের গ্রীল দেওয়া একফালি বারান্দায় বেতের চেয়ারে আধশোওয়া হয়ে বাবা, মেঝেয় বিছোনো মাদুরে শরীর রেখে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সে। এই সমস্ত মুহূর্ত ছিল সম্পূর্ণ তাদের দুজনের, অন্তরঙ্গ আর ব্যক্তিগত। সেইসব সন্ধ্যেয় খাপছাড়া, টুকরো টুকরোভাবে অসিত ব্যক্ত করত অনেক কথা, যা হয়তো শুধু রমার জন্য, একান্তভাবে তারই জন্য। বাবার বাষট্টি বছরের অস্থিদেহে মাঝেমাঝেই লক্ষ্য করত ক্ষণিকের মৃদু শিহরণ, স্মৃতি তোলপাড় করা ক্ষোভ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ থেকে জন্ম নেয় যা। তাদের মা যখন মারা যান, সে তখন পাঁচ, দাদা আরো চার বছর। মায়ের স্মৃতি সীমাবদ্ধ বসবার ঘরের কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে আর হলদে ছোপ-পড়া পুরনো অ্যালবামের পাতায়। সেই জীর্ণ ধারণাকে উস্কে দিত অসিতের আত্মকথন, অদেখা এক ছবি জীবন্ত হয়ে উঠত রেখাহীন কাগজে।

—'চা টা খেয়ে নে রমা, ঠান্ডা হয়ে যাবে'—আলগোছে আঙুলের ধাক্কায় টেবিলের গা বেয়ে পেয়ালাটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল চৈতালি। স্কুলের বন্ধু, কলেজেও পড়েছে একসঙ্গে। পরশু রাত্রে তার সঙ্গে চৈতালিও হাসপাতালে গিয়েছিল। ডাক্তার তখনই জানায়, কনভালশন হচ্ছে, মাঝে মাঝে রক্তবমিও। শেষেরটা এর আগেও কয়েকবার হয়েছে অসিতের তাই নতুন কোনো আশঙ্কার সম্ভাবনা খুঁজে পায়নি রমা। দাদা হয়তো আঁচ করেছিল, লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে এসে তার সামনেই চৈতালিকে বলেছিল,—'আজ রাতটা যদি তুমি রমার সঙ্গে থাকতে পার, খুব ভালো হয়। আমাকে আজ এখানেই থাকতে হবে, কিছু প্রয়োজন হতে পারে'।

তখনো অবশ্যম্ভাবী ভয়ে ভীত হয়নি রমা, বুঝতে পারেনি বাঁশি বেজে গেছে, ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষায়। চৈতালি আপত্তি করেনি। গত সাত আট মাসে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সে আগেও দু'একবার রমার সঙ্গে থেকেছে যখন মনোরঞ্জন হাসপাতালে। বাসে ফেরার সময় স্বাভাবিকভাবেই কন্ডাক্টরের দিকে দু'টাকার নোটটা এগিয়ে দিয়েছিল রমা। বাড়ি ফিরে রাতের খাওয়া হয়ে যাবার পর, বিছানায় শুয়ে গল্পে মগ্ন হয়েছিল দু'জনে। মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ এক অনুভূতি তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করার চেষ্টা করছিল। গত সাত-আট মাস ধরে এই ছুঁচের জ্বালাটা সহ্য করছে রমা, তার দংশনে যাপন করেছে অসংখ্য বিনিদ্র রাত্রি। ক্রমশ গা-সওয়া হয়ে আসছিল। আরো দৃঢ়ভাবে সইয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সে অযাচিতভাবে প্রাণখোলা হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল, তাদের দীর্ঘ বন্ধুত্বের স্মৃতি রোমন্থন করার মাধ্যমে।

ওপরতলার মেসোমশাই কখন বেল বাজিয়েছিলেন খেয়াল নেই। তন্দ্রাচ্ছন্ন নিদ্রার অপরিণত আবেশ থেকে সচকিত হয়ে উঠে এসে দরজা খুলেছিল সে, সঙ্গে চৈতালি।—'দাদার ফোন!' শোনামাত্রই দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছিল চৈতালি। আকস্মিক বিহ্বলতাবশে কিছুটা শ্লথ গতিতে রমা। শীতঘুমে মগ্ন, কুন্ডলি পাকানো সরীসৃপের মত পড়ে ছিল কালো রিসিভারটা। আগে পৌঁছানোর সুবাদে কথা বলেছিল চৈতালিই, হয়তো এমনও হতে পারে আগে থেকেই আন্দাজ করে চৈতালি ইচ্ছে করেই তাকে ফোনটা ধরতে দেয়নি।

কি কথা বলেছিল চৈতালি, মনে নেই তার। শুধু মনে আছে কথা শেষ হবার পর রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে দীর্ঘ সময় নিয়েছিল সে। এত দীর্ঘ যে তার বিরক্তি আসছিল, অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল দুটো ভিন্ন আকারের

কালো শরীর কখন আবার জুড়ে এক হবে, তা ভেবে। যেন ওই সংলগ্নতার উপরই নির্ভরশীল ছিল অসিতের জীবন।

রিসিভার রেখে ঘুরে তাকিয়েছিল চৈতালি। চোখ তুলেছিল রমা, দুজনের দৃষ্টি একই রাস্তায় এসে ধাক্কা খেয়েছিল। চৈতালি কিছু বলেনি, জিজ্ঞেস করেনি সেও। হয়তো চোখের ভাষাতেই ছিল অনুচ্চারিত সব কিছু। গতরাত্রের প্রতিশোধ নিতেই যেন ছুঁচটা লোহার শলাকা হয়ে তচ্‌নচ করছিল তার স্নায়ু আর চেতনা। উরুর নিচে কম্পন অনুভব করতে করতে বুঝেছিল সে হাল্কা হয়ে আসছে, তার আরোপিত ভারসাম্য নির্লজ্জ কাপুরুষের মত পলায়নোদ্যত। শরীর মেঝে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে এসে পড়েছিল দুটো হাত, কার জানে না, সম্ভবত চৈতালিরই। অন্তরতম অনুভূতি থেকে জন্ম নেওয়া এক অচেনা, অদৃশ্য অন্ধকার তাকে টেনে নিয়েছিল অভ্যন্তরে।

॥ ৩ ॥

পাড়ায় ঢোকার আগেই বুঝতে পেরেছিল মনোরঞ্জন, আলো নেই। গতকালও যখন শ্মশান থেকে ফিরেছিল সম্ভবত আলো ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই, তখনো আকাশে রোদ ছিল যথেষ্ট, মন্থর গতিতে বিচরণকারী এক পশলা হাওয়ার আভাস থাকায় ফ্যানের প্রয়োজনীয়তাও সেভাবে অনুভূত হয়নি। বাড়িভর্তি অসংখ্য লোকের মধ্যেই কেউ মন্তব্য করেছিল অসহিষ্ণুভাবে—'এইসবের মধ্যে আবার লোডশেডিং!' মন্তব্যটা কানে আসতে সচকিত হয়েছিল মনোরঞ্জন, লোডশেডিং নিয়ে নয়, একটা ঘটনা ঘটে গেছে যার বিরাট তাৎপর্য থাকার কথা, অন্তত তার কাছে তো বটেই, যেমনভাবে পিতার মৃত্যু তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে সব সন্তানের কাছে। সেই তাৎক্ষণিক সচেতনতার কারণেই সে আরো বেশি করে কর্তব্যপরায়ণ হবার চেষ্টা করেছিল। ভীড় বা লোকসমাগম সে কখনোই পছন্দ করে না, সবসময়েই খুঁজে নেয় কোনো নিজস্ব কোণ। গতকালের জনসমাগম একসময় তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। রাস্তার মোড় ঘুরে বাড়ির কাছে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার আশংকা তীব্র হয়ে উঠল, গতকালের মত না হলেও, আজকেও বাড়িতে যথেষ্ট লোক থাকবে এবং অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে লৌকিকতা। লোহার ছোট গেটটার ছিটকিনি খুলে দরজার কড়ায় যখন সে আঙুল ছোঁয়াল, তখন অন্য সব বোধ অগ্রাহ্য করে প্রধান হয়ে উঠেছে বিরক্তি।

আওয়াজ শুনে রমা বুঝেছিল দাদা এসেছে। অনুমান নয়, অসিত এবং মনোরঞ্জন, দুজনের কড়া নাড়া এবং বেল বাজানোর ধরন তার সুপরিচিত। অসিত যেখানে একাধিকবার বেল টিপে ঘোষণা করত তার উপস্থিতি, দাদা সেখানে অনেক নিঃশব্দ, কিছুটা লজ্জিত ভাব, সম্পূর্ণ অচেনা বাড়িতে গিয়ে প্রাথমিক পরিচয় দেবার সময় যেমন। নিজেই উঠে গিয়ে দরজা খুলল সে।

অসিতের মৃত্যুর পর এই প্রথম তাদের সরাসরি দৃষ্টি নিক্ষেপ; অপরের দৃষ্টিতে নতুন সন্ধানের প্রচেষ্টা। ঠোঁটের ভাঁজে হের ফের ঘটিয়ে সামান্য হাসির হদিশ আনার চেষ্টা করল রমা। মনোরঞ্জন কিছুটা অপ্রস্তুত, দ্বিধান্বিতও। ঈষৎ জড়তার শ্লেষ্মা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল—'দেরী হয়ে গেল, এত জ্যাম রাস্তায়.....'—দীর্ঘকাল বাদে একসময়ের ঘনিষ্ঠ দুজনের সাক্ষাৎ হলে যেরকম সময়জনিত অস্বস্তির সূচনা হয়, তাদের এই মুহূর্তও অনুরূপ, দুজনেই অনুভব করল তা। রমা সরে আসে একপাশে, ধীর পায়ে মনোরঞ্জন ঘরে ঢোকে।

অসিত বলত তাদের দুজনের ভাব-ভঙ্গি, আচার আচরণ একেবারেই পরস্পরবিরোধী। তাদের এই মানসিক ভিন্নতার কারণ, অনেক অনুসন্ধানেও খুঁজে উঠতে পারেনি রমা। জরুরী দরকারে তারা একে অন্যের সাহায্যে এসেছে ঠিকই কিন্তু সে আচরণে সম্পর্কের গভীরতাকে বহুগুণে ছাপিয়ে গেছে প্রয়োজনের তাগিদ। মনোরঞ্জন স্বভাবত অন্তর্মুখী। রমা চাকরীতে ঢোকার পর তাদের দেখাসাক্ষাৎ স্বাভাবিকভাবেই আগের থেকে কমে যায়, দৈনিক কথোপকথন এসে সীমিত হয় দু'চারটি অসংলগ্ন বাক্য বিনিময়ে। চারিত্রিক পার্থক্যজনিত কারণে তাদের

মাঝখানে মাথা তুলেছে প্রায় অনতিক্রম্য এক প্রাচীর, যা যথেষ্ট শক্ত ভিতের উপর নির্মিত এবং যা ডিঙিয়ে ওপারকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা তাদের কেউই করেনি। ক্রমে জন্ম নেয় ঘৃণা নয়, এক অপরিচিত নির্লিপ্তি, যা সম্ভবত ঘৃণার চেয়েও কঠিন, নিষ্ঠুর। ঘৃণার মধ্যে তবু থাকে মানবিক চেতনার আত্মপ্রকাশ, কিন্তু নির্লিপ্তি তো সম্পূর্ণভাবেই অমানবিক।

আকস্মিক চিন্তাবশতঃ রমার হঠাৎই মনে হল, অসিতের অবর্তমানে তাদের সম্পর্কে কি নতুন কোনো মোড় আসার সম্ভাবনা রয়েছে? হয়তো অসিতের মৃত্যুই সেই সর্বগ্রাসী প্লাবন যার তোড়ে এতদিনের নিস্পৃহতা নিছক খড়কুটোর মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হয়তো।

পোশাক পরিবর্তন করে বাইরের ঘরে এসে বসল মনোরঞ্জন। যতজন থাকবে ভেবেছিল, তত নেই। সামান্য কয়েকজন। কথাবার্তা প্রত্যাশিত পথেই চলছে, সদ্যপ্রয়ানের পর যেমন চলে। নির্দিষ্ট বিরতিতে এক একজন করে বিদায় নিল। পরশু রাতের পর চৈতালি এখনো অবধি পুরো সময়টাই এ বাড়িতে, আজ সকালে কিছুক্ষণ বাদ দিয়ে। বহিরঙ্গে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। পরিস্থিতিতেও নেই সেরকম কোনো বৈচিত্র্য যা নতুন ভাবে উজ্জীবিত করতে পারে। ওকে এবার ছুটি দেওয়া উচিত, ভাবল রমা।—'তুই এবার এগো চৈতি, আর কতক্ষণ বসবি! আটটা তো বাজতে চলল!' —মনোরঞ্জনও সম্মতি জানিয়ে বলে 'হ্যাঁ এগিয়ে পড়ো এবার। বাড়িতেও নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন সবাই।'

আপত্তি করে না চৈতালি। সত্যিই দীর্ঘক্ষণ সে বাড়ি ছাড়া। দাদা এসে পড়েছে যখন, রমার নিশ্চয়ই তার সাহচর্যের বিশেষ প্রয়োজন নেই। দরজা অবধি তাকে এগিয়ে দেয় রমা।

লোডশেডিং চলছে এখনো। বসবার ঘরের সেন্টার টেবিলটার ওপর দপ্‌দপ্‌ করে কাঁপছে ক্ষীণকায় মোমবাতির শিখা। বেশ গরম লাগছে এখন। ক্লান্তও। মোমবাতিটা নিভিয়ে বারান্দায় আসে মনোরঞ্জন। আরাম লাগছে। ঝিরঝিরে ঠান্ডা একটা হাওয়ার আভাস।

নিজস্ব অনুভূতির বিশ্লেষণে মগ্ন হবার চেষ্টা করল মনোরঞ্জন। সময় আর পরিস্থিতি দাবি করছে পরিবর্তন। অসিতের মৃত্যুর সম্ভাব্য পরিণতি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে সে। গত কয়েক মাস যাবৎ নিভৃত বিশ্লেষণের সুযোগ পায়নি। তার, রমা এবং অসিতের ত্রিকোণ বোঝাপড়ায় সে ছিল আগাগোড়াই এক বিচ্ছিন্ন কোণ। অসিত তার বাবা, রমা বোন। বাবা আর বোন, দুটো ভিন্ন সংজ্ঞা ছাড়া কাউকেই সে নিজস্বভাবে দেখেনি কখনো। হয়তো তার অন্তর্মুখীনতাই এজন্য দায়ী। তার এবং রমার সম্পর্ক সবসময়েই অহেতুক মনে হয়েছে. রমার প্রাণোচ্ছলতাকে মনে হয়েছে অত্যধিক, তার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের পাশে নিজেকে বেমানান লেগেছে। অসিতের সঙ্গে রমার সম্পর্কের বিশেষত্ব প্রসঙ্গে সে সম্পূর্ণ সচেতন। তার এবং অসিতের মধ্যে সেরকম কিছু গড়ে ওঠেনি, সম্ভাবনা থাকলেও তা অংকুরেই হয়েছে বিনষ্ট। অসিত আর রমা যতই আত্মজ হয়েছে ততই তার আবেগ আর বোধ জানিয়েছে তীব্র নীরব প্রতিবাদ। তাদের কণ্ঠরোধ করে অন্তর্মুখী নির্লিপ্তিতে আশ্বাস খুঁজেছে সে। আজ এই মুহূর্তে, অন্ধকারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিভৃত আলাপচারীতায় তার মনে হল, অসিত আর রমা তার কাছে ক্রমশ শুধু 'অসিত' আর 'রমা'ই হয়ে উঠেছে, রক্তের বন্ধনে তাদের বাবা আর বোন পরিচিতিকে অগ্রাহ্য করে। সে কারণেই তাদের কেন্দ্র করে শোকের মত কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতিও তাকে আর নাড়া দেয় না।

কখন সে খেয়াল করেনি, রমাও এসে বসেছে বারান্দায়। হয়তো অনেকক্ষণই কারণ তার বসার ভঙ্গিতে রয়েছে সহজ বিস্রস্ততা যা চিহ্নিত করে সময়ের সঙ্গে একান্ত বাক্যালাপ। অপরাহ্নের প্রগাঢ় অস্বস্তিটা পুনরুত্থানের প্রচেষ্টায়। তার নিভৃত ভাবনার সুতো হঠাৎই ছেঁড়ে রমার প্রশ্নে।

"বাবা মারা যাবার সময় তুমি কেবিনে ছিলে?'

উত্তরে কিছুটা সময় নেয় মনোরঞ্জন। গলায় জমেছে অবাঞ্ছিত কিছু শ্লেষ্মা। উত্তর দেয়—'না। কেবিনে

তো রাত্রে থাকতে দিত না। ভিজিটরস্ রুমে ছিলাম। সাড়ে চারটে নাগাদ ওয়ার্ড-ইন-চার্জ এসে খবর দিল, মিনিট পনের আগে……'

'শেষ দিকটায় তো স্ট্রোক হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, মারা গেল কার্ডিয়াক অ্যারেস্টেই। শ্বাসকষ্ট রাত্তির থেকেই শুরু হয়েছিল, অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছিল। চেষ্টা যথেষ্টই করেছে।'

এই আশ্বাসের পুনরুক্তিই কি রমা চাইছিল? ঠিক বুঝে উঠতে পারল না মনোরঞ্জন এবং সে কারণেই অবুঝের মত কথার খেই ধরে রাখল—'একদিক দিয়ে দেখলে ভালোই হয়েছে। ক্যান্সার পেশেন্ট, সেরে ওঠার তো কোনো সম্ভাবনা ছিল না। একদিন না একদিন এরকম হতই। ভুগলোও তো যথেষ্ট, প্রায় আট মাস। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। আমাদেরও টেনশন রইল না আর, টাকা পয়সারও সাশ্রয় হল……'

'দাদা!'

মসৃণ পথে চলতে চলতে আচমকা বাধাপ্রাপ্ত হলে যেভাবে আটকে যায় গাড়ি, মনোরঞ্জনও সেরকমভাবে হোঁচট খেল, থামল এবং বোধগম্যতায় আনার চেষ্টা করল পুরো ঘটনাটা। রমার কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যা তার এই হঠাৎ স্তব্ধতার কারণ, অনেক কিছুই ছিল যা নির্দিষ্টভাবে আলাদা করে বলা শক্ত। ক্ষোভ, রাগ, বেদনা, অসহায়তা এবং সর্বোপরি আশাভঙ্গের দ্যোতনার মিশ্রণ যে অশ্রুতপূর্ব অনুভূতির জন্ম দেয় তা এখন মনোরঞ্জনের শরীরের আনাচে-কানাচে ঝড় তুলতে লাগল নামহীনতায় আচ্ছন্ন সেই ঝড়, যা প্রজ্ঞা আর যুক্তিবোধকে অসাড় করে সৃষ্টি করার চেষ্টা করে নতুন বোধ।

পাশ থেকে ভেসে এল একটা নতুন শব্দ, একটানা, যা ব্যক্তিগত এবং মানসিক টানাপোড়েনের বহির্প্রকাশ। পরিস্থিতির বিচারে তা প্রত্যাশিত, বিশেষ করে রমার ক্ষেত্রে, তবু মনোরঞ্জনের কাছে নতুন ঠেকল। তার আভ্যন্তরীণ ঝঞ্ঝার গতিবেগ প্রসারিত হল অন্য মাত্রায়।

ভাঙতে শুরু করেছে রমা। ভাঙনের পথে এগিয়ে চলল মনোরঞ্জনও। তবে তার ভাঙন অন্য। যার পরিমাপ হয় না কোনো দৃশ্যমান মাপকাঠিতে, যার রেশ অনুভূতিকে শুধু আচ্ছন্নই করে না, করে তোলে ভিন্নতর উপলব্ধিতে পরিবর্তনশীল।

॥ ৪ ॥

গভীর রাত্রের মাদকতা শীতল করে তুলছিল তপ্ত বহিরঙ্গকে। বিছানায় শুয়ে গত বেশ কিছু ঘন্টার মতই সমাধানহীন গণিতকে সরলের চেষ্টায় ছিল মনোরঞ্জন। দক্ষিণের অলিন্দ দিয়ে ভেসে আসছিল চঞ্চল হাওয়া।

এমন অঙ্কও হয় যার সমাধান থেকে যায় অদৃশ্য। হিসেব নিকেশের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তার ব্যাপ্তি ভিন্নতর আকারে প্রকাশিত হয় উপলব্ধির গভীরে। সে হতে পারে অনুতাপ। বেদনা। বা শোক, যার সন্ধান থেকেই উৎস অঙ্কের। মুহূর্ত গড়ে তোলে মানুষ আবার মুহূর্তেই বদলে আনে অন্য মানুষ। অসিতের মৃত্যু এখন শুধুমাত্র মৃত্যুর বেড়াজালে আবদ্ধ নয় তা মৃত্যুপরবর্তী উপলব্ধিতে স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে বিপন্ন অনুভূতির।

শয্যা ত্যাগ করে মনোরঞ্জন। নিঃশব্দ পায়ে আসে পাশের ঘরে। নিদ্রিত রমা। মুখের উপর খেলে বেড়ায় এলোমেলো কয়েকগাছি চুল। ফাঁকে ফাঁকে আনাগোনা করে কৌতূহলী জ্যোৎস্নার রেখা।

রমা কি স্বপ্ন দেখছে? হয়তো। স্বপ্নের প্রয়োজনেই তো সৃষ্ট মানুষ। তার যাবতীয় মানবিকতা স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রেরণায় উদ্দীপিত। স্বপ্নজগতে মানুষ সবসময়েই মানুষ।

জ্যোৎস্নার গন্ধ নিয়ে ছুটে এল একরাশ দমকা হাওয়া। তাদের পদক্ষেপে এখনো শীতের আবেশ। হাড়-

মাংসে অস্পষ্ট রিনরিনে ধ্বনি, সংকোচন। পায়ের কাছে ভাঁজ করে রাখা চাদরটা খুলে বোধহীন শিশুর প্রতি নির্দিষ্ট যত্ন নিয়ে রমার শরীর আবৃত করে দেয় মনোরঞ্জন। শোক আর শোকহীনতার পার্থক্য চেতনালুপ্ত হয়। রমার শরীরে খেলা করে জ্যোৎস্না—এক অন্য স্বপ্ন।

অন্য স্বপ্নেই তো সৃষ্ট হয় অন্য মানুষ। পাথর ভেঙে উৎসারিত হয় জল। মরুভূমি বিদীর্ণ করে সবুজ।

চন্দ্রালোকে স্থির, অচঞ্চল থাকে চাদরে আবৃত, স্বপ্নাচ্ছন্ন তার রক্তের বন্ধন। বিগতযৌবনা শীতের হাওয়া তিরতির করে কাঁপতে থাকে শরীরে। গভীর রাত থাকে চরাচরে ব্যাপ্ত।

ঋতু আর রাতের সান্নিধ্যে, জ্যোৎস্নার ক্রীড়াভূমিতে, অন্য স্বপ্নে আবিষ্ট হয় এক অন্য মনোরঞ্জন।

একটি অ্যাডিশনল কম্পালসারি পত্রের প্রশ্ন অথবা উত্তর ধরা যেতে পারে

চিরঞ্জীব সরকার

সময় আমাদিগকে পার হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। সময়ের গন্তব্য বিষয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। সময়-প্রবাহের মধ্যবর্তী এই যে মানবজীবন তা কোন্ আঘাতে অসহ হয়ে উঠেছে তা ভাবি। গতিতত্ত্বের ছেলেমানুষী পড়াশুনা থেকে বলতে ইচ্ছে হয়, সময়ের প্রবাহমধ্যে তুলনায় যে স্থানু অচঞ্চল এই অস্তিত্ব তা সময়ের গতিতে ঘর্ষণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর ককিয়ে ককিয়ে আবহে বেজে ওঠে, 'আমার আর ভালো লাগে না'।

এই অস্তিত্বের স্বস্তিহীনতা থেকে মানুষ তার পরিপার্শের বিভিন্ন সম্পর্ক সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিকতায় লালন করতে চায়। *"সংঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়/আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়"* (সুরঞ্জনা/জীবনানন্দ দাস)। অথচ দেখা যায় প্রতিটি সামাজিক সম্পর্ক এমনকি নিকটতম রক্তের সম্পর্কের মধ্যেও কোথায় যেন এক অমোঘ এবং অনির্দেশ্য ব্যারিকেড থেকে যায়। একই প্রেক্ষিতে ও শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যে বেড়ে উঠেও দুটি মানবক এই অনিবার্য বাধা অতিক্রম করতে পারে না। মানুষের মধ্যে যে জন্মগত হীনতার স্থিতি, তার বহির্প্রকাশ এই উদ্ধত বাধাটির কারণেই বলে মনে হয়। মানবজীবনের এই জাতীয় সমস্ত অক্ষমতা ও সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণের আশায় যখনই কোন ছবি আঁকিয়ে, সাহিত্যকার, দর্শন-ভাবুক এগিয়ে গিয়েছেন, জড়িয়ে পড়েছেন এক সমাধানহীন জটিলতায়। আর সেই জটিলতা অতিক্রমের উদ্দেশ্যে তাঁরা রূপায়িত করতে বাধ্য হয়েছেন ভবিষ্যত প্রজন্মের এক মুখপাত্রকে। এই মুখপাত্রের উপস্থাপনায় রচনাকারের মানবসভ্যতার প্রতি সহানুভূতি, আপন উদ্দেশ্যের সততা ও অক্ষমতার দাহ স্পষ্টত অনুভব করা যায়। কিন্তু এই উপস্থাপন ভঙ্গিমা আবহমান কালের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। কতগুলি খাপছাড়া উদাহরণ দিয়ে ফেলা যায়। ভিনসেণ্ট ভ্যানগগের 'পোটাটো ইটারস' ছবির সেই দর্শকের দিকে পিছন ফিরে থাকা মেয়েটি কিংবা 'ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সী'-র সেই বাচ্চা ছেলেটি। জীবনানন্দের বহু পরিচিত কাব্যাংশ—

"এই পথে আলো জেবলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে,
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;—
প্রায় ততদূর ভালো মানবসমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।" (সুচেতনা)

বা দেবদারু বৃক্ষের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসা অমলিন বাতাস—এ সবই ঐ ভবিষ্যতের দিকে চোখ মেলে থাকা। অথচ এতো দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রতিদিন অস্তিত্বের জটিলতার ঘন কুহকে জড়িয়ে পড়ছে। কোনওভাবে নিস্তার মিলছে না।

বিভিন্ন দার্শনিক বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে সমান সুখী করে তুলতে যে প্রয়াস নিয়েছেন, বারবার দেখা গেছে মানুষের উপর এই শুভবুদ্ধি চাপিয়ে দিতে গিয়ে তার অবদমিত পশুত্ব আর হীনতা বীভৎস চেহারায় ফেটে পড়ে সমস্ত পরিকল্পনা বারবার নষ্ট করে দিয়েছে। যে মানুষ বুদ্ধিতে জোরে শ্রেষ্ঠত্ব আদায় করতে

চেয়েছে এতকাল সেই মানুষ শেষমেশ সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা উপেক্ষা করে আদিম বর্বরতায় মেতে উঠে সমস্ত শুভ-প্রয়াস বাণ্ডাল করে দিয়েছে।

এই ব্যাপক জটিলতা থেকে অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের যে অসহায়তা, প্রাত্যহিক জীবনে যে ঘৃণা উঠে আসছে তা সমাজের পরিচিত অপরিচিত অন্যান্য সমব্যথীর কাছে পেঁছে দিতে সে বেছে নিয়েছে শিল্প মাধ্যম। অর্থাৎ সাহিত্য শিল্পকৃতির জনন এই সময়ের প্রতিস্পর্ধার পথেই। কিন্তু যখনই এই অসহায়তা জানার অথবা জানাবার স্পৃহা থেকে পাঠক কিংবা রচনা কার নিজস্ব রঙ্গভূমিতে নেমে পড়েন, দেখেন অদ্ভুতভাবে সমস্ত বক্তব্য ও তত্ত্ব এক একটি ছোট ভ্রম আশ্রয় করে উঠে এসেছে—যা ঐ বক্তব্য বিষয় বা তাত্ত্বিক আলোচনার ধ্বংস ডেকে আনে বা আংশিক অর্থবাহী করে তোলে। একটি কবিতা বা গদ্য প্রথম পাঠে আপ্লুত করলেও আরও মনোনিবেশে ক্রমাগত পাঠে তা আর সেই প্রথমের নাড়াটি যেন দেয় না। একজন রচনাকার কোনও রকম সৃষ্টির প্ররোচনায় যে আবেগ অনুভব করেন, সেই আবেগের স্থায়ী রূপায়ণে আর তত তীব্রতা থাকে না। প্রসঙ্গত শেলীর আশ্রয় নেওয়া যায়—

"A man cannot say, 'I will compose poetry'. The greatest poet even cannot say it ; for the mind in creation is as a fading coal which some invisible influence, like an inconsistant wind, awakens to transitory rightness ; this power arises from within like the colour of a flower which fades & changes as it is developed, and the conscious portion of our natures are unprophetic either of its approach or its departure. Could this influence be durable in its original purity & force, it is impossible to predict the greatness of the results but when composition begins, inspiration is already on the decline, and the most glorious poetry that has ever been communicated to the world is probably a feeble shadow of the original conception of the poet."

(A Defence of Poetry)

অন্যদিকে গানের ক্ষেত্রে কথা-আশ্রয়ে যার রূপায়ণ তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও একথা সত্য। অথচ বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কথ্য অর্থবহতা প্রায় না থাকলেও তা কথা মিশ্রিত গানের তুলনায় গভীরতর সহবেদন আনে নিঃসন্দেহে। হেরম্যান হেস্ তাঁর 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে শব্দের যে অর্থবহনের সীমায়িতির কথা উল্লেখ করেছেন তাই এখানে প্রযোজ্য—"Everything that is thought and expressed in words is one-sided, only half the truth ; it all lacks totality, completeness, unity".

তাহলে একজন কথা নির্ভর ভাষা-শিল্পীর উপায়ন্তর কি ? শুধু এই সমাধানহীন প্রশ্নের তাড়নায় বর্তমান লেখকও বিভিন্ন কবিতা ও গদ্যের আশ্রয় নিয়েছে। তবু এই প্রশ্নের খোঁচা পরিচিত পাঠকমহলে পেঁছান সম্ভব হয়নি। নিরুপায়তাবশতঃ—যদিও এই প্রাবন্ধিক আচ্ছাদনহীনতা বর্তমান লেখকেরও কাম্য নয়—এই আকাঁড়া গদ্যের অবলম্বন বেছে নিতে বাধ্য। মনে রয়েছে পূর্বোক্ত 'সিদ্ধার্থ' কথিত প্রকাশের সীমাবদ্ধতার কথা। যদি এই প্রয়াসও কিছুমাত্র উদ্দেশ্যমূলক খোঁচায় সফল না হয় কিংবা যদি এই প্রশ্নের সমাধান পাঠকের কাছে জলপ্রতীম সহজ হয়ে থাকে তবে তা বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত ব্যর্থতা। আর যদি পাঠকও এই সমাধানহীনতা বুঝে কেঁপে ওঠেন আরও একবার, তবে বোঝা গেল এই অসহায়তা ও ব্যর্থতা সামগ্রিক মানব সভ্যতার।

সত্য তার সীমা ভালোবাসে

দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

'চিরকুমার সভা' নাটকের অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার মনে হয় 'চিরকুমার সভা'র ইংরাজী করা অসম্ভব। তার ব্যঙ্গ, তার শ্লেষ, তার সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত বেশি বাঙালি। বাঙলাদেশে শ্যালী-ভগ্নীপতির সম্বন্ধ অনন্যসাধারণ। এমনকি ভারতের অন্যত্রও নেই। অন্য প্রদেশের পাঠক এই ব্যাপারকে আপত্তিজনক বলে মনে করতে পারে।"

শ্যালিকা-ভগ্নীপতির অনন্যসাধারণ সম্বন্ধ অনেক সময়েই নরনারী সম্বন্ধে গিয়ে দাঁড়ায়, রবীন্দ্র সাহিত্যেই তার নিদর্শন 'দুই বোন' উপন্যাসে শশাঙ্ক-ঊর্মিমালার সম্বন্ধ। বাঙলাদেশে আরেকটি সম্বন্ধও অনন্যসাধারণ, দেওর-বৌদির সম্পর্ক। তার মধ্যেও যে প্রেমের আকর্ষণ জন্মাতে পারে 'নষ্টনীড়' তার নিদর্শন। কিন্তু যেখানে এই সম্বন্ধ নর-নারীর প্রেমের পর্যায়ে না গিয়ে সুমধুর সৌহৃদ্যের এক অপূর্ব বাতাবরণ রচনা করে। 'ঘরে-বাইরে'র মেজবৌঠান ও নিখিলেশের সম্বন্ধ তারই স্বাক্ষর। আমাদের প্রাচীনকালের আলঙ্কারিকেরা একেই হয়তো বলতেন —"মনোময়ীসৌহৃদ্যরীতি"; যার বৈশিষ্ট্য হ'ল—"সদৈকাভাসদৈকরূপাঅবিকারা"; অর্থাৎ এই সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্যের সমস্ত ঘনিমাটুকু থাকলেও তার মধ্যে কোনো বিকার নেই।

"ঘরে-বাইরে"র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ "The Home And The World" প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই ইংরেজী অনুবাদে মেজ বৌঠানের পৃথক চরিত্র নেই। একজনই আছেন, তিনি বড়ো বৌঠান। কিন্তু মূল 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বড়ো বৌঠানের মধ্যে বৈধব্যের আচারপরায়ণতাটুকুই রয়েছে। মেজো বৌঠানের মধ্যে রয়েছে ঠিক তার বিপরীত উপাদান 'রঙ্গ চাপল্য'। বিমলা বলেছে, "আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প—তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক এক-দিন নিজে রেঁধে মেজো দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন।"

বিমলা এর মধ্যে "পুরুষমানুষের একটু চঞ্চলতা" কল্পনা করে ঈর্ষায় দগ্ধ হোত। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের শেষদিকে মেজোবৌঠানের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভাঙনে বিমলার ভূমিকা প্রসঙ্গে নিখিলেশ বলেছে, 'মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনও কখনও এমন হয়েছে যে মনে হয়েছে বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না।" উপন্যাসের পাঠকেরও এই ভুল ধারণা জন্মাতে পারে যে মেজো বৌঠান বিমলার সুখ সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা। তাঁর আদিরসাত্মক সংগীত ও বক্রমন্তব্য থেকে তাঁর সম্পর্কে পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু মনে রাখতে হবে এইসব ধারণাই মূলতঃ বিমলার নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত থেকেই সঞ্জাত হয়েছে। সেই দেখার ভঙ্গীটি যে কতো ভুল, তার একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। বিমলা উপন্যাসের প্রথমে বলেছিলো, নিখিলেশের সঙ্গে সে যদি কোলকাতায় চলে যায় তবে মেজোবৌঠান রাজবাড়ির একচ্ছত্র অধিকার পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন। অথচ উপন্যাসের অন্তভাগে আমরা যখন দেখি নিখিলেশ কোলকাতায় যাবে বলে মেজো বৌঠানও তার এই সুদীর্ঘকালের শ্বশুরের ভিটার সমস্ত শিকড় নিজের হাতে ছিন্ন করে নিখিলেশের সঙ্গে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন সমস্ত বাহ্যিক নিমোথ খসে গিয়ে নিখিলেশের প্রতি তাঁর নিত্যকল্যাণকামী স্নেহময়ী নারী-সত্তাটি হঠাৎ উন্মোচিত হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি, সন্দীপের প্রতি বিমলার ক্রমবর্ধমান আসক্তিতে মেজো বৌঠান যে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন, তার মূলে ছিলো নিখিলেশের দাম্পত্য জীবনের নির্বিঘ্ন প্রবহমানতা রক্ষা করার স্বার্থলেশহীন শুভকামনা। মেজো বৌরাণি এতোটুকু পাণ্ডুর নন। প্রাণচাঞ্চল্যে সজীব ও সরস। মেজো

বৌঠান রাজবাড়িতে নববধূ হয়ে আসার পর বালক দেওর নিখিলের সঙ্গে যে সখ্যলীলা, তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর আর একটি লীলাময় সম্পর্কের কথা। সে সম্পর্ক নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের। যখন স্ত্রী, বাল্যবন্ধু, অনুচর, পরিজন সকলেই নিখিলেশকে পরিত্যাগ করেছে, প্রবঞ্চনা করেছে—সেই সর্বব্যাপ্ত বিপর্যয়ের মুহূর্তে মেজোবৌঠানের মধ্য দিয়ে যে স্নেহ ও শুভেচ্ছা স্নিগ্ধ মমতায় উৎসারিত হয়েছে, সেখানেই নিখিলেশের জীবনে মেজো বৌঠানের বিশেষ স্থানটি অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে অমূল্য অনেকটা catalyst-এর মতো ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণতঃ, রবীন্দ্র সাহিত্যে এই জাতীয় কিছু কিছু সুকুমার তরুণের দেখা মেলে যারা নিজেদের অভীষ্ট আদর্শের উদ্দেশ্যে 'হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন'; 'রক্তপদ্মঅর্ঘ্য উপহার' নিবেদন করে যেতে পারে। আমাদের স্বভাবতই জয়সিংহ, সুপ্রিয়, অভিজিৎ বা কিশোরের কথা মনে পড়ে যাবে। অমূল্য এদেরই দলে। বিশেষতঃ কিশোর ও নন্দিনীর সম্পর্কটি অংশত অমূল্য-বিমলা সম্পর্কের অনুরূপ। তবে 'রক্তকরবী'তে কিশোরের মধ্যে প্রেমের মাধুর্য্য বড়ো হয়েছে। অমূল্যর মধ্যে সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

অমূল্যর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়তো বিভ্রান্ত রাজনীতির পাকে কিভাবে কিশোর ও তরুণেরা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হচ্ছে তারই একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে চেয়েছিলেন। মায়ের একমাত্র ছেলে অমূল্য সন্দীপের বাক্যমায়া-জালে অভিভূত হয়ে যোগ দিয়েছিলো তার ভন্ড দেশপ্রেমের নেশার আসরে। কিন্তু সন্দীপের প্ররোচনার ফলেই যখন জমিদারির মধ্যে হিংস্র দাঙ্গা শুরু হোল, তখন সন্দীপ কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেছে। অমূল্য কিন্তু দাঙ্গা থামাতে গিয়ে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছে। সন্দীপের সহচর নিখিলেশের সঙ্গী হয়ে এই যে বীরের মৃত্যু গ্রহণ—এরই মধ্যে দিয়ে অমূল্যের সগোত্রে প্রত্যাবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিমলার আত্মস্থতা ও মোহমুক্তি ফিরিয়ে আনার কাজে অমূল্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সন্দীপের লোভের গ্রাসে বিমলা যখন ছ-হাজার টাকার গিনি সমর্পণ করেছে, তখনই অমূল্যের মারফৎ সন্দীপের আগ্রাসী লোভের চেহারাটি প্রথম বিমলার মর্মে গিয়ে পৌঁছেছে। এরপর বিমলা অমূল্যের হাতে যখন গোপনে নিজের গয়নার বাক্স তুলে দিয়েছে, তখন সন্দীপের ঈর্ষা, সন্দেহ ও নির্লজ্জ হঠোক্তি সন্দীপ সম্পর্কে বিমলাকে আরো নির্মোহ করে তুলতে সাহায্য করেছে। শেষে সন্দীপ যখন সেই গহনার জন্য অমূল্যের বাক্স ভেঙেছে এবং উত্তেজিত অমূল্য বিমলার কাছে সন্দীপের বাক্যজালের তলে তলে যে উগ্র লোভের ছবি আছে তাকে ব্যক্ত করেছে, তখনই বিমলার মুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। বিমলা যখন ভেবে পাচ্ছে না, ঐ ছ হাজার টাকা যোগাড় করার কি পথ, তখন অমূল্যই চরমার কাছারিতে ডাকাতি করে ঐ ছ-হাজার টাকা বিমলার হাতে এনে দিয়েছে। এই ডাকাতিতে বিমলার যে তীব্র অনুশোচনা দেখা দিয়েছে তারই মাধ্যমে বোঝা যায়, বিমলা তার স্ব-ধর্মে ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত বিমলার নির্দেশে অমূল্য যখন ঐ টাকা ফেরত দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে এবং নির্ভীকভাবে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তখন বিমলা বুঝেছে যে তাকেও কৃতকর্মের জন্যে নিখিলেশের সামনে দাঁড়াতে হবে। এই সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সৎসাহস বিমলা পেয়েছিলো অমূল্যের কাছ থেকেই। উপন্যাসের শেষে অমূল্য চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হলেও সে বিমলার মোহমুক্ত সত্যবদ্ধ হৃদয়ে চিরদিনের আসন লাভ করেছে।

'ঘরে বাইরে'র চন্দ্রনাথবাবু আমাদের সহজেই মনে করিয়ে দেন 'চিরকুমারসভা'র চন্দ্রমাধববাবুকে, এক ধরণের আত্মনিবেদিতপ্রাণ, আত্মভোলা, আদর্শবাদী, স্বভাববৈরাগী বৃদ্ধের চরিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে বারে বারে দেখা দেয়। হয়তো দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতি এর মূলে কাজ করে থাকবে। সঞ্জীবচন্দ্র একবার বলেছিলেন, "বার্ধক্যের মতো সুন্দর আর কিছু নাই।" তখন জীবনের চাঞ্চল্য ও অশান্ত বাসনার উৎক্ষেপ প্রশমিত হয়েছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহু অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ভূয়োদর্শিতা, কনিষ্ঠজনের প্রতি কল্যাণকামনা। এই রকম পরিপূর্ণ বার্ধক্যের প্রতিনিধিই যেন চন্দ্রনাথবাবু।

লক্ষ্য করার বিষয়, 'গোরা'য় পরেশবাবু যেমন জন্মদাতা পিতা নন ; তেমনি চন্দ্রনাথও নিখিলেশের জন্ম-দাতা নন। আসলে তাঁরা তার চেয়েও বড়ো। তাঁরা শিক্ষাদাতা পিতা। একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে যে, পিতা তো শুধু জন্ম দেন মাত্র, কিন্তু গুরু শিক্ষা দেন। তাই যথার্থ গুরু পিতারও পিতা। তাই নিখিলেশের কাছে চন্দ্রনাথবাবু হলেন 'পিতানাম পিতৃতমোঃ।"

বঙ্গভঙ্গের যুগে বয়কট পন্থা ও সন্ত্রাসবাদে যাঁরা উত্তেজনার আগুন পোহানোকেই 'মুখ্যকর্ম' বলে গণ্য করে-ছিলো তাদের থেকে অনেক দূরে ছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। তাঁরা হচ্ছেন ঐতিহাসিকের ভাষায়, "Constructive Swadeshi" অর্থাৎ আত্মসংগঠনই দেশসংগঠনের প্রাথমিক শর্ত একথাই তাঁরা মানেন। Nationalism কেই তাঁরা "যথার্থ পন্থা" বলে মনে করেন না। উদার মানবতাবাদই তাঁদের অভিষ্ট। আর এখানেই নিখিলেশ তার অনুগামী। উপন্যাসে যে দাম্পত্য সংঘাতের ছবি আছে, তা আসলে চন্দ্রনাথবাবুর আদর্শের সঙ্গে সন্দীপের আদর্শের সংঘাত। লক্ষ্য করার বিষয়, সন্দীপ বহুবার চন্দ্রনাথবাবুকে ব্যঙ্গ করেছে। পরোক্ষে অপমান করতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু কখনও পাল্টা উত্তর দেন নি। এই ধৈর্য্যময় আত্মসংবরণের মধ্যেই তাঁর আদর্শের ধ্রুব দিকটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁকে static চরিত্র ভাবলে ভুল হবে। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় তিনিই সবার আগে নিখিলেশের দাম্পত্য জীবনের বিপর্যয় অনুমান করতে পেরেছিলেন। স্নেহই আত্মপ্রকাশ করেছে অকম্পিত সতর্কতায়। তাই তাঁর ভিতরের অশান্তির ভাবটি উপন্যাসে স্পষ্ট। আর এই inner tension-এর মধ্য দিয়েই চন্দ্রনাথবাবু জীবনানুগ চরিত্র হয়ে উঠেছেন।

মেজোবৌঠান, অমূল্য কিংবা চন্দ্রনাথবাবুকে তাই বলা যেতে পারে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্রের জীবনের ছবি আঁকবার ক্যানভাসস্বরূপ। অবিরাম তাঁরা সূত্রসংযোজনায় কিংবা পরিপ্রেক্ষিত রচনায় প্রেরণা দিয়ে গেছেন। অথচ আদপেই বেশী জায়গা জোড়েন নি 'ঘরে বাইরে'তে। কারণ তাঁরা সত্য দৃষ্টির উন্মোচন-সহযোগী। নিজেরাও তারই প্রতিভূ। আর "সত্য তার সীমা ভালবাসে।"

৪৩১০৭

কবিনী চৈচৈ ও তাঁর পঞ্চস্বামীর কন্সটিপেশনাল আদিখ্যেতার প্রাকৃতপৈঙ্গল

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

ধিক্কদলণ থোংগদলণ ভক্কদলণ রিংগএ।
ণংণুণুকট দিংগত্তুকট রংগচলন্তু রংগএ ॥

—প্রাকৃতপৈঙ্গল

কবিনী চৈচৈ। কোবিনি চোঅি্চোঅি

হেঅি্গো আমাগো কতো কতো গতোরাতো খাঅে্আ হঅে নাঅি। আম্‌রাও লজ্‌জাতে শালোআর ভিজিঅে ফেলেছি। কার্‌তুজ্ঞ গানের প্‌রোতিরাগে পিরিতের ডানাঅে অ্‌ড্‌ডিন বেহিশেবে বোকুল্‌তলাঅে। মেজোমাশি শেজোমাশি অিত্‌তাদির দাম্‌পত্‌তোকোর্‌না মান্‌শের ছক ঘেঁটে পেন্‌টাগনিঅো প্যান্‌ট্‌ল। ব্‌রিশ্‌টি পরে ব্‌রিশ্‌টি পরে আর মোনে পরে গতো বর্‌শাঅে আমার তল্‌কোমোরে দাদ হোঅে্ছিলো। গান গাঅি্তে গেলেঅি নোরে অ্‌ঠ্‌তো কশের দাঁত তাধিন তাধিন। অথোবা ধিন্‌তাশ্‌রে নাচ্‌তো গা পোরানো মাঅেরা অ্যামোনি।

শম্‌প্‌র্‌নো অিচ্‌ছে থাক্‌ছিলো নিজোশ্‌শো বশোতি অ্যাক ঘিরে নেআ। হঅে্‌তো শেখানে অনির্‌বান ধ্‌ম্‌জোতি আভাঁগার্‌দ শিল্‌পের বাচাল প্‌র্যাক্‌টিশ। অবিম্‌রিশ্‌শোকারিতাঅে পালি বা প্‌রাক্‌রিতে শ্‌ধ্‌ ঘ্‌ম্‌খ্যালাঅে খ্যালাঅে যেতে জাচ্‌ছি পেআরের ঢঙ নিতি অো ঢপের ফান্‌শে। বিপ্‌লব বিপ্‌লব ধান্‌দাকলে জম্‌পেশ ঘ্‌র্‌ছে শব শাহিত্‌তোক্যারানি তাল্‌প্‌ক্‌রে ঘোটিতে জনোতাঅে। জনোতা জনোতা হে আমার অবাক জনোতা। প্‌রোক্‌রিতোঅি তোমাদের ভালোবেশেছি ভআনোক।

অথোচো হারেমে জাগ্‌রোতো দেবোতার অদ্‌রিশ্‌শো পাঅি্অ্‌তে জে মেঅে গান ছেঁরে শ্‌রোম অো ঘ্‌মের তাকে পোতিরা পঁ্যাদাতো। দেখ্‌ক দেখ্‌ক শে দেখে ব্‌ঝ্‌ক কি চোল্‌ছে জত্‌নের নামে মোশাহেবির প্‌রাক্‌রিতোপোঅিঙ্‌গল। অোধিকারে শান্‌তিশঙ্‌গ্‌রামি অ্যাক্‌ঝাঁক কোব্‌তর বিভ্‌রোমে শাঁতার্‌ শোমঅে। শিশ্‌রা জেনেছে হারামির মতোন বেহেড অবিদ্‌দাঅে শ্‌চেতোনাশিল্‌পো ফাঙ্‌গাশ। ছিন্‌নো শির আন্‌তে পারলে রাজা দেবে প্‌রোশ্‌কার। অন্‌ধো হঅে্রানির দেনাঅে দেবে কি পিরিতি।

ভালোবাশা শব্‌দোটির বিশাক্‌তো দাঁত থেকে জে মোঅি্অ্‌র অ্‌রে আশে অন্‌ধের চোখের বালিতে চরাচর। ক্‌রিশ্‌নোচুরাঅে জে গন্‌ধো পাঁজ্‌রার ব্যারেলে জ্‌রোঅে নিতি নিতি। রাধিকার ঘ্‌ঙ্‌রে ঘ্‌ঙ্‌রে ঘ্‌ন্‌পোকা। আর হঁ্যা অোঅি ভালোবাশা শব্‌দের লোভার্‌তো দাঁতের বাঁধা বাঁশির ধিক্‌কার পাতাল্‌মাতোনে শোঙ্‌শার। তোকে দোবো শ্‌র্‌জের গোলাপি ফ্যানাঅে ব্‌জে ব্‌জে অোঠে নাচ নাচ নাচে আঅে অোশে পাখিটি পাখিরে। শ্‌মিতো ঘর্‌পোরা জেহেনো দেখেছে বিশ্‌শে শিশ্‌ গন্‌ধোমাদোন আর পাহারে পাহারে কুর্‌পর। তার রাধা রাধা জোঅ্‌বোনভাঙা দ্‌র্‌গে তারিঅে আঁত্‌তোমিথ্‌ন্‌শার্‌থেঅি জিজ্ঞাবাঅি শ্‌ক্‌লিঙ বানাঅে। হোরিনের চোখে অ্যাখোনো কিকোরে ম্‌নিগন শোত্‌তম শ্‌ন্‌দরম শিব খ্‌ঁজে ফ্যালেনি তাঅি তাঅি্রে নাঅি্রে। অেতো ঠিক তোমাদের শঙ্‌গে মাতোনের কথা অ্যাক্‌শাথে পাঅে বলো তরাঅিন্‌জ্‌দ্‌ধের বিহতো শোঅি্নিক। তালিকাঅে মেলে ধরো শচেতনোতা। ভেবে ফ্যালা প্‌রোনো অোব্‌ভেশের অবোশ্‌শস্‌ভাবি ম্‌রিদ্‌ শিহরোন। অ্‌দ্‌ধার তুমি কি কোর্‌বে হে জিহোবা জিহোবা।

স্বামী এক | শামি অ্যাক

কবিনী চৈচেয়ের সঙ্গে যখন আলাপিত হই হুযায় কবিনী বললেন ব্রহ্মাণ্ডের মূল গণ্ডগোল কী জানো।

আগ্রহে বাড়িয়ে দিই ঘাড়। ফ্যালফ্যাল চোখ পড়তে থাকে কবিনীতে। আর কবিনী সো ইসি। সো ন্যাচরাল। কেন তুমি মানতে পারছো না। হোয়াই।

অগত্যা বৈভবে জলপোলো। সাঁতারের আগুনবিকেলে রেশারেশি। দরিদ্র কচ্ছপ স্যালাইনবোতল গিলে বেবাক মাতাল। মাসি কি পিসি যখন খেতে দ্যায় দ্যাখো না কেমন বোবা হয়ে থাকে ওরা নিজের ভাগ্যেড়ে। খোঁয়াড়ে খোঁয়াড় আর ভাগিরথীপাড়ে ছিলো ঘর অধিবাস। বুনো মোরগের ঝুঁটিতে ঝোলানো ব্রীড়া স্বপ্নাসত্যে দুর্গন্ধিত। হায়রে প্রকৃতি।

শিবসন্ধ্যের বিসুখী রচনায় স্মৃতিদূতে ঘুমকালো মোজা এক আনে। ছিটেফোঁটা ফেলে যায় ফেরারী মগজে। জলে গান যথারীতি বাষ্পীভূত হয়। কবিনী বিবস্ত্রা হলে বুনো মোরগেরা গাঁথে হারপুনে নিরর্থকতা। যম যেন তালশাঁস। এলেবেলে ঘুরপাকে সঞ্জিবাগান। মননে গুনগুনোচ্ছে জ্ঞানী উকুণ আর তার মেধাবী ঝুলপি।

সেই চড়কমেলায় ছেঁড়া ফাটাতালি দেয়া কড়িকাঠ। সুভাষিত গুগলি ছাড়ছে বিষাদে পেখম তুলে আনত ডিসেম্বররাতে একাদোকা। এক আমি ক্রমশ বহুত্বের মোক্ষে নানা জানাজানা সিঁড়িও পেরোয় মস্তি। পুলিশের ল্যাজে কেউ পা না দিও বাপা। অথবা দিতে পারো স্যাঙাত হলে মন্ত্রীর কোটালপুত্রের। তুমি তো জানোই প্রিয়ে আত্মার বেবুশ্যেপনা পরিণামে গূঢ়।

স্বামী দুই | শামি দুজি

আসুন বন্ধুগণ নাশ্লীলতার বিরুদ্ধে সমবেত হই। আসুন ভাইসব শব্দের গায়ে মেরে দিই সামাজিক স্ট্যাম্প। আর যাবতীয় দায়ভার বর্তে দিই রাষ্ট্রে পুলিশে গুন্ডায়। হে তুমি অমুক অমুক নাশ্লীল নাশ্লীল শব্দ লিখিয়াছো কেন হে পুঙ্গব। তুমি কি জানো নাই আমরা বড়ো ধীর। শান্তিপ্রিয় জাতি। আমাদের পায়ুতে কপিধ্বজ। আমরাই মন্ত্রে পাগল আর অস্ত্রেও তান্ত্রিক। অতএব আমরাই খোদা আজ শুদ্ধশিল্পের।

বিসমিল্লা। তা নাহয় তুমি শেষ খোদা হলে এবং মোড়ল। গরমিল্লা। হ্যাঁ যাহয় তুমি বেশ খোজা হলে এবং গাড়ল। হারাকিরি। যদিও শুয়োর ঝোলে মাচায়। আর সে বেধড়ক চ্যাঁচায় ফ্যাঁচায়। কেঁচিয়ে দিতে চায় সমস্ত রান্নারেসিপির গল্পকল্প। তাকে দাও ঋদ্ধির সহায়ক সখ্য। না থাক। কমিউনের ব্যাপার কবিনীই ঠিক বলতে পারবেন।

এভারগ্রীন অস্তিত্ব মানে মূলত শ্মশান। কেননা শ্মশানেই স্বভাবের বর্ণপরিচয় হয় অবর্ণনীয়।সিদ্ধিদাত্রী হে তোমার আরাধনায় সময়কে চাবুক কষিয়ে পাগলা ঘোড়ার কবরে শুইয়েছি দ্বিধাসিস্টেমে। র‍্যাফাইড ভুলেরা আমার স্নোবাইটস দেখে ফ্যালে পরাক্রান্ত রাসায়নিক রামায়ণ। থেকে থেকেই রামের নাকি নাভিশ্বাস উঠতো সীতে সীতে। সীতা তখন ভাবছে পুরুষতন্ত্রের সাথে লড়াইটা তার। ম্যায় হুঁ রীয়্যাল হীরো জাতীয় হশ্বিতে শুধু শুধু রাবণেরই ক্ষতি। কেননা ততোদিনে খাইবার আর্যানুগমনমাহাত্মে বিপ্লবউত্তরবর্তী নক্সালবাড়ীর ক্ষীর ধেয়ে গ্যাছে উকিল ও কোকিলে। হ্যাঁ কোকিল তো বসন্তেরই বজ্রনির্ঘোষ। আমার দ্বিতীয় বাবার কথা এটাই।

স্বামী তিন | শামি তিন

কবিনী চৈচে গভীরে মুচকি হাসেন। এসবে গা দোলেও তাঁর। পাঁচ পাঁচটা অঙ্গুরীয়ে ছায়া ছায়া পাঁচ ভাতারের অবিকল ট্রাইবাল সৌরবলয়। স্কক থেকে ফরাশী পারফিউম ফুটিয়ে তুলছে ক্ষুদিরামের গিলোটিন। চৈচে বলেন ইউ সী। করনা কেয়া হ্যায়। বোমটোম না ছুঁড়লে আল্টিমেটলি ক্ষুদিরাম করতোটা কী। আনারসের

বাগানেটাগানে একা একা ফড়িং ধরার নেশা না হয় হিপি ও সুফিদের। কিন্তু স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়।

চৈতন্যে যে অত্যন্তভেদ যুক্তিবিহনে তোতা বাদামী পিয়ানোয় ছাই ভুলে হাত দিচ্ছে শরীরের গোপন ম্যান্ডোলিনে। অশরীর মানেই শুদ্ধতা এই বাক্য চারিদিকে ছড়াইয়া দাও। দেখো যেন স্বভাবসম্মত রিপু ঘটলেও ঘটবেই কেননা ঘটেই তো। ঘটনার ঘটা যেন নাহি জানে কেউ ঘনঘটা। করতেই পারো। আমিও তো করি। মানে তোমাকে বলছি তুমি কিন্তু প্লীস ভাই লীক কোরো না। প্রকাশ্যে বলবে নুডিস্টরা খারাপ কারণ তুমি ভয় পাও। যদি তারা চেপে বসে তোমারও যাপনে। তবে তো আশা নেই সমাজপতিদের।

ব্রন্টোসরাসের জন্যে পায়েস রেঁধেছি গোপনে। অসূর্যস্পশ্য অকুন্থল ক্রমভাঙনে থুরথুর। ময়ালের ক্ষমতাকুন্তিতে শিব ও বৌদের বুদ্বুদ। দেবরাজ জিউসের সঙ্গে মতপার্থক্যের ফলে বহুকাল ফেরার ছিলাম দিলাতাঁতে আভাঁগার্দ আর্টে। আর্টই। কেননা শিল্প বললে ইন্ডাসট্রীও তো মনে হতে পারে যা থেকে যোজন যোজন দূরে আমি বহুৎ বছর। পেটের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে ব্রহ্মান্ড বোঝার সাধ হয় নি তাইই জনতাকে বেবাক বোঝালে ডিভাইন জ্বর থিয়োরীর ঘায়ে ঘায়ে ঘায়ে।

স্বামী চার | শামি চার

অনুরুদ্ধে যে বেবাক ভ্রান্তি তার নোখদাঁত সমুদ্রের নোনা বায়ু অবিশ্রাস কব্জা থাচ্ছে রাধে রাধে। চৈচৈ জন্ম নিচ্ছে বেহিসেবী সমুদ্রসঙ্গমে রাধাচূড়ার পাটাতন। শ্বশুরের জন্ডিস। আরো দুই রূপমুগ্ধ প্রণয়ীও আছে বাহাইন্ড পেরিফেরি। সব্জি সব্জি অহংকার চাশিল্পের রপ্তানীযোগ্য আলুথালু ডলার পাউন্ড পাউন্ডাল ডাল। শাঁখের বিদেহে আছে চৈচৈ ট্রালা।

ট্রালালা লালাট্রা। খবর মিলছে প্রাচীন ইউরোপের গ্রীকরোমান কুলটুরে হাহাহাহা মহাশব্দে ভেঙে পড়ছে প্রকান্ড স্টেডিয়াম সার্কাস ম্যাক্সিমাস। অযাচনা সম্পন্ন বিভাবে স্বকে আনলো গাধাচক্রকে অশোক। অশোকতরু ছায়াঘিরে স্বপ্নেরও কষ্টিপাথর। রূপে তো ক্লিওপেত্রা হেলেন টেলার সোফিয়া মনরো মেরিলিনের থেকে দুশো আলোবছর দূরে নিজস্ব মেরুতে গা হিম। অ্যাপীয়ারেন্সের দর্শনধারিণী তোমাদের দেবী আর আমার পুত্রের মায়ের কথা বলি। মানে আফ্রোদিতি। মানে চৈচৈ। মানে আর্ট আর বেবুশ্যে ইন্ডাসট্রী দুটোরই বাংলা করেছে ওরা শিল্প। পথকে রাস্তা।

অদ্যাপি প্রচলনের ক্ষুরে ব্রহ্মকর্ণে মেরুণ পুষ্পক চাঁচ হোক শুধুমাত্র বিশেষ্য অব্যয় ক্রিয়ায়। নো ম্যাটার অব রিফিউটেশান। কবিনী অ্যান্ড হার পঞ্চস্বামী হ্যাথ অফন বোরড মী ইন ভাইস অ্যান্ড ইন্সটিটিউশানাল প্রেজুডিশেস। স্টিল আই স্টেইনলেস বেটার দ্যান দ্য গভর্নমেন্টাল এডুকেশান চেইন। স্ট্যান্ডিং অ্যাম আদার অর্বিড। আই রীমেইন ফ্রেইন্ডস ফর ইউ ফর অ্যান্টিঅ্যাকাডেমী অ্যান্ড ফর দ্য হিউমেন চার্বাক গ্রামার। আমি আছি এই মাত্র। ছিলামও না পূর্বে। আর ভবিষ্যে থাকবোও না চরাচর।

স্বামী পাঁচ | শামি পাঁচ

ছিলিমে ছিলাম ছিনালীতে একথা বলার জন্যে ঢাকঢাক গুড়গুড় পন্ধতিটি ফেল করিছে আমার নিকট। চেকারকেও ইহা বলি তুমি হে চেকার। জীবনের পরম রেফারি। তোমাকে চুমি হে। অ্যান্ড ইয়েস্টার আফটারনুন কেম ইয়োর স্কার্ট। টোল্ড মী টুস্ট রুম ইন নস্ট্যালজিক ফ্রেশ ফ্লেশ অ্যান্ড ফেস। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ফেস মাস্ট ইমার্জস দ্যাট ব্রেকিং বটল বীফোর দ্য প্লাশ স্টপ। কীস আই দ্য ডেথ। লাভ ওয়াস ডান্সিং টুয়ার্ডস মাই নেকলেস ব্লাডী নাইটমেয়ার্স। কীস আই দ্য গ্রীন। মর্বিড গ্রীন।

সবুজে সবুজ আহা তোর নাকি বাপ লকআউট। সবুজে সবুজ রাজ্যে তোর নাকি মা ভোগে অপুষ্টি আর রক্তাল্পতা। সবুজে সবুজ তোর ছোটো ভাই ব্ল্যাক করে ম্যায় নে পেয়ার কিয়ায় টিকিট। সবুজে সবুজ হাঃ তুই

নাকি বোলে ফেলিস ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যানটিকে প্রধানমন্ত্রী আপনার বাবা বাট সরি আই অ্যাম। ইনফীরিয়ার হী ইস টু মী। সবুজে সবুজ তুই ফুটে যাস না খেয়ে না খেয়ে দুনিয়ার রেচনাশিক্ষাসিস্টেমে। তোর মরাই ভালো। চূড়ান্ত নির্বেদে তুই মর বিষ গিলে। তুই মর। ফুটে যা।

কেননা তিনি বাঁচিলে আমাদিগের সামাজিক সবুজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবেক। তিনি অস্তিমান হইলে মেইনস্ট্রীমের মেষের শৃংখলায় আইসে বিকল্প অ্যানার্কি'র ঢেউ না অ্যাটাক। তিনি তাঁর দু হস্ত প্রসারণে দ্যাখান সমগ্র আকাশ তাঁর মাইল মাইল জোড়া দু চোখে ধুসর। তাঁকে ভয় পাই। দোদুল্যমান শ্রেণীর চশমায় যেহেতু ছবি তাঁর নাই। তিনি খোদারও খোদা আর খোজারও খোঁজা। আমাদের খোজা খোদারাও তাঁকে ভয় পান। তিনি পরম নাস্তিক। তবু দু বুক জোড়া অ্যাতোটা ভালোবাসা পেলেন কোথায়। এসো গবেষণাগারে। তাঁকে শহীদ বানাই। তিনি বাঁচিলে লোকসান। যুদ্ধে। প্রেমে। মুতাশায়।

শ্মশান বান্ধবী

সুপ্রিয় ঘোষাল

॥ ১ ॥

বানাও বাসা নষ্ট পাখির কামে
আধঘুমন্ত এখন নৃত্যগৃহ
প্রাককথনের শোভায় সেজেছিলে
ক্ষমার জন্যে ব্যথিত হও কেন ?
অনুজ্জ্বল এ মুখের মাধুরিমা
কোথায় আমার ব্যর্থ সে সাতকাহন
ঘুমপাড়ানি শব্দ মাধুর্যে তাই
অনন্যতায় মুখর সহনশীলা।
প্রারব্ধক্ষয় অন্তে আতসবাজী
শহর তুমি নিকটকামী প্রলয়
অসুস্থ হয় আগুন প্রজাপতি
মুহূর্ত তাই অন্নে ছড়াও আলো।

॥ ২ ॥

স্বজন গিয়েছে খোয়া নদীতটে সমুদ্র সকাল
চিতার অন্তিম জুড়ে বসবাস
আরক্তিম মুখোশ ছুঁয়েছে,
জমায় আসর বসে কজন বয়স্য আর শ্মশান বান্ধবী
হেঁটে যাব ওড়ে ছাই চিলতীক্ষ্ণ চোখের রোদ্দুরে।

॥ ৩ ॥

চেনাপথ ছিল বিদায় নেবার জন্যে
মেঘলামতীর দুয়ারে বিলীন আস্থা
প্রয়োজনে ছিল নির্বাক পরিনির্বাণ
প্রয়োজনে ছিল ব্যস্ত পথের সীমানা
তাও মাধুর্যে বিলুপ্ত হয় সৈকত
বিদায় নেবার চাতুরীও অস্পষ্ট
অসাবধানতা অবলম্বিত বাস্তব
অক্ষমতায় নির্বান ও বিধ্বস্ত

॥ ৪ ॥

বিশল্যকরনীর ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে অঞ্জলি দিয়েছো
দ্বিজত্বের ঊষাকালে তৃণাঙ্কুর তবু হ'ল ম্লান
পরিত্যক্ত প্রাসাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে লুব্ধ অকাল
ভস্মাধারে নৈবেদ্য অতঃপর সাজাও আর্যক।

॥ ৫ ॥

প্রণয়ের প্রান্তে তুমি নিরাময় ছিলে
নিরুদ্ধ বাক্যের বোঝা দাঁড়িয়েছে মুগ্ধ মিছিলে
নিষ্প্রাণ নাচঘরে হেঁটেছে সময়—মহাকাল
উঠোনের অপরাহ্ন সততার প্রশ্নে ভেঙে যায়।
নিমিত্তের দোষারোপ ক্ষমা করে দাও আয়োজনে
শ্মশান বান্ধবী তুমি উপেক্ষা কর প্রতারণা
আত্মমেহনের পাপ বিক্ষোভে সংবেদ্য ক্ষয়
কিম্বা মৃত্যু নাও নিলীমায় স্পষ্ট হোক ক্ষত।

রূপান্তর

।সৌম্য দাশগুপ্ত

পাঁজরা অব্দি মিথেন ক্রিয়া, তুমি যাবে কোথায়। সমীকরণের লঘু ক্রিয়া
মগজে ঢুকছে, গোটা গোটা আমড়া-খোসের মত, পাঁচড়ার মত
কাইশুদ্ধ আছড়ে পড়ছে তোমার পাতে। পাত বলতে জগন্নাথের টুকরো,
এ-পান্সি ও-পান্সি হয়ে হুগলী বরাবর ধুম হয়ে চলেছে
রিষড়া বৈদ্যবাটি শ্রীরামপুর।

মফস্বলগুলি চিমনি বেয়ে বেয়ে কেমন নাগরিক হয়ে উঠল।

ছোট্ট থেকে পাগল পাগল ব'লে তোমাকে ঝাঁঝরা করে দিল, এলিতেলিরা
রাস্তায় দেখতে পাওয়া মাত্র লাথি মারে আর তুমি, চকিত মার্কিংবার্ড,
অ্যান্টিকাস্ ফিনচের মত মার্চপাস্টে মন্থর হয়ে যাও—

নাতিপুতিরা কঠিন জি-কে মুখস্থ করছে, তাদের দুলে দুলে পড়ার
বহর দেখে তুমিও স্বপ্ন দেখ একদিন কার্পেটে তোমার ঘর মোড়া হবে,
বাথরুমে টাইলস্ বসবে, পেট খারাপ হ'লে কমোড ভরে যাবে
ফ্লাশমারা জলে।

আসলে এই রকমই বাদাবনজুড়ে শেয়ালের ডাক রূপান্তরিত হয়ে
যায় অতর্কিত মাল্টিস্টোরিডে, সে আরো ঝুঁকে হাঁটতে থাকে
জবাকুসুমপুর থেকে কুমোরটুলি, ঝুঁকতে ঝুঁকতে থুতনিএসে মিশে যায়
মাটিতে, পা তখনো কাদায় ঘষড়াচ্ছে.....

মধ্যরাতে আমি তার কুচ্‌কাওয়াজ শুনি।

স্বায়ত্ত রেখা বরাবর

তন্ময় মৃধা

ডানার দৈর্ঘ্যের মধ্যে সেই তর্ক জিজ্ঞাসার ক্লান্তি হয়ে
তৈরী করে বর্গাকার অলস আকাশ
এই পৃথিবী বিষয়ক যা কিছু চরিত্রহীন
বহু নীচে চোখে পড়ছে খানা-খন্দ-নদী
ও সাগর—তিন ভাগ জলের গায়ে একঘেঁয়ে
বসবাস গড়ে নিয়ে স্পর্ধা দেখাচ্ছে
যে মানুষ—সেন্ধ ঘরদোর থেকে
ঊর্ধমুখী ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে
বোঝা যাচ্ছে রান্না হচ্ছে।
শতকরা আশি ভাগ মহিলার দায়িত্বহীন হাসাহাসি
আমার ডানার সঙ্গে সরল সমঝোতায় থামছে
স্থিতির উৎকানী।
মেঘের নিষুপ্তি ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছি
অবসাদে ভারী লাগছে
স্থানীয় আবহাওয়ার গায়ে পালকের ছড় টানছি
খেদের মধ্যাহ্ন জুড়ে সুর বাজছে বিপদ সংকেত
এতদূরে শূন্যের মাঝখানে—তবু—অবিশ্বাস্য ঝড়ের দাপট
ধ্রুপদী স্থিধার মধ্যে আবছা লাগছে নক্ষত্র সন্ধান
উড়াল—উড়াল দাও
গতি দাও—নশ্বর পৃথিবী, তার অশ্লীল সম্পর্ক ছিঁড়ে উড়ে যাব—
গতি দাও—
রাত্রির মলটি খুলে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে
বেগুনী বন্দর · ফ্যাকাসে খালাসি তার খয়েরী চুলের মধ্যে
হাত গুঁজে মুছে নিচ্ছে রাতের কুয়াশা
হাঁ করা নাবিক—এই বন্দরের বিশ্বস্ত শিকার
তুমি যাও—বন্দর আমার জন্যে নয়॥

নষ্টচন্দ্র

অচ্যুত মণ্ডল

তিনটে শালিখ ঝগড়া করে রান্না ঘরের চালে,
প্রসঙ্গত এ ওর দিকে আড়ালে আবডালে
তাকাচ্ছিল অনবধান প্রয়োগসম্মত
চাঁদ দাঁড়ালেন জানলা জুড়ে টর্চলাইটের মত।
একটি শালিখ রাঁধেন বাড়েন আরেক চড়ুই খান
তৃতীয় চিলের ডানায় তখন ভিজে মাটির ঘ্রাণ।
একটি মানুষ ঈষৎ প্রমা, দ্বিতীয় তার প্রমাণ
তৃতীয় মানুষ যখন যেমন তখন ততো 'রোমান-
টিকের' থেকে উড়িয়ে দিলেন অনুরাগের ছাই
বিপ্রতীপে অনুবাদক চাঁদ বলেছেন 'যাই'।
প্রথম মানুষ, দ্বিতীয় সত্তা, তৃতীয় ব্যক্তি নিয়ে
চাঁদ গড়েছেন সংসার আর চাঁদ মানুষের বিয়ে
দেখতে হেসে বাইরে এসে তৃতীয় লোকটি 'থ'।
শুকনো চোখে দেখে ফেলল চাঁদের চোখে জল।

গালিলিও গালিলেই

ব্রাত্য বসু

শীতকাল এলেই আমার শরীর থেকে পাতা খসে পড়তে থাকে।
পুরনো সব লোভ জেগে ওঠে কোষের ভিতর ;
বার্চগাছের শরীর ঘেঁষে হাওয়ার আলতো ঝটকা চলে যায়,
এই আরামপ্রদ শ্রেণীসংগ্রাম—
শীতকাল এলেই আমার ভীষণ দুঃখ হয় তৃণা।
শীতঘুমে আমার আস্থা নেই,
কেন না অ্যারেনার ভিতর ফুটপাত দিয়ে অসহ্য রাত্রি,
একুশে নভেম্বর, দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যে সাড়ে নটা,
গন্তব্যস্থল হাড়ের মধ্যে কনকনে স্রোত জানিয়ে দিচ্ছে
তুমি মাতাল হয়ে গেছ।
তোমার ইগোইস্ট চোখ আর কামার্ত ঠোঁট বলে দিচ্ছে
তুমি স্পষ্টতই কোন আঁচলের কোণ খুঁজে বেড়াচ্ছ।

শীতকাল এলেই তাই সারা শরীর খিদেয় জ্বলতে থাকে।
ট্যালকম পাউডার দুধে-ভাতে ছড়িয়ে দিই পাঞ্জাবীর ভিতর,
ভেসালিনের চক্রান্ত চলে প্রেসিডেন্সী-পোর্টিকোয়,
নারীর নাভিতে খুঁজে পাই কস্তুরীর ঘ্রাণ, এই সব বরফচেরা
কাঠকল আর নীলস্কার্টের এক চিলতে ভাঁজে
জমাট হয়ে থাকে মাঘমাসের বিকেল, ট্রামলাইন
পার হয়ে নিজস্ব চতুরতায় মৃত্যু খুঁজে পাই,
শীতকাল এলেই অ্যাকাডেমির ধারে
অ্যালবেট্রস পাখীর আলতো ঝাপট, ঘাড় ঘোরালেই
ময়দান উড়ে গেল, উড়ে যাচ্ছে আকাশ,
আমার শরীর থেকে পাতা খসে পড়তে থাকে,
তুমি সাক্ষী ছিলে, তুমি, গালিলিও গালিলেই,
সে তার দিদির সঙ্গে এসে দাঁড়াল চার্চের গেটে।

এসব নিঃশ্বাসের কোন অর্থ নেই জেনে আমাদের
পানপাত্রে ঢেলে নিচ্ছি টিফিনবক্স, জিঞ্জার জিন,
আপাত ব্যর্থতার অভিমুখে পিকনিক-স্পষ্ট ঠিক
হল পাল্লারোড, তুমি বলে দিলে ফরমায়েসী জামা
পরে আসি শীতকাল, আর তারপর কুয়াশা এসে
গ্রাস করে ফেলল অনন্ত প্রহর, হুইসল বেজে
উঠল সংশ্লিষ্ট যাত্রায়.....
এইসব লোভ তুমি বলেছিলে।
তুমি জেনেছিলে।
তুমি সাক্ষী ছিলে গালিলিও গালিলেই।

অনুরাধা ঘোষের কবিতা

অনুরাধা ঘোষ

জীবন প্রায় বিব্রত করার মতো বড়ো। তাই,
বৃষ্টি নামে যখন, হঠাৎ, সেই অসুস্থ ধারাকে ভাবা
যায় কালান্ত ডিল্যুজ, ক্যান্টিনের সুখাদ্য সব
নিষিদ্ধ ফলের মতো হয়, পতন, সুন্দর এতো,
কুদৃষ্টি এতো মনোরম, এমন আনন্দের এই
ক্লান্তির মতো সন্তোষ!
এতখানি সত্যি কথা
একসঙ্গে বলে ফেলে, হঠাৎ হোঁচট খাওয়া যায়।
বুর্জোয়া এই দেশে মিথ্যেরা, সার বেঁধে,
আনাচে কানাচে থাকে, সত্যবাদ থামবেই
কোনোদিন ষড়যন্ত্রে তাই। চিন্তার কিছু নেই, চলো,
অবিব্রত জীবনের রঙচঙে অনবদ্য দেশে।

রাত কাটলেই

অর্পণ চক্রবর্তী

রাত কাটতে না কাটতেই দিন আসে, শঙ্খচুড়ের শব্দে
বাতাসের গন্ধে ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে যায়, কারা যেন
কারা যেন অস্পষ্ট আলো-আঁধারি-আলোয় পূর্ণিমার রাতকে
বুকের মধ্যে পুরে ফেলবার চেষ্টা চালায়, চাঁদ হাসে
প্রেমিকা রাধার দুঠোঁটের ফাঁকে, অরণ্য মাতাল হয়, মাথা ঝাঁকায় চাঁদকণা
কারা যেন হেঁটে হেঁটে প্রিয়তমা রমণীর উরুদেশে
তাম্র ভোজালি বেঁধায় রক্ত পড়ে না এক ফোঁটাও
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে হিরণ্য-আকাশ, প্রিয়তমা রমণী নিথর নীরক্ত।

দুপাশে অগনন ভিড়, বধ্যভূমে নারী আর পুরুষের দেহ
কে কাকে জড়িয়েছে ? কেউ কাউকেই না। দেহের উপর দেহ
ফেলে গেছে ওরা, আবাসন বর্ষে স্থান নেই তাই,
সারাদিন সারাদিন দাউদাউ জ্বলে হেলমেট পরা মাথা
বধ্যভূমে বিশাল মিছিল, বিশাল মিছিল বধ্যভূমে।

রাতে হাসে পূর্ণিমার চাঁদ—আমার দু'পাশে
দু'পাশে দাঁড়ায় দুই প্রাচীনকালের নারী, অলৌকিক সুখে,
অলৌকিক সুখে চেয়ে থাকে নির্নিমিখ সারারাত,
সারাটা গভীর রাত—তারপর শঙ্খচুড়ের শব্দে
ভোর আসে বিবস্ত্রা রাধারা নামে ঘোলা জলে
ইভ খেলা করে হাঁটু ভেঙে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে
অরণ্য মাতাল হয়।

সঙ্গম অথবা.....

শমিত রায়

পিঠের উপর আকাশ নিয়ে
শুয়ে থাকা—
উদার বুক যখন
একাত্ম হয়ে যায়
গর্ভের মাটিতে,
কোল পেতে আদর নেয়
নরম ঘাস—
শিশিরভেজা হাতের চেটোর
সুখাবেশ
উরুসন্ধির ভাঁজ খুলে তুলে আনে
জটিল জন্মবীজ ;
নিরন্ত সন্ধানের ক্লান্তিকর তৃপ্তি শুধু
গভীর অন্ধকারে
রোপন করে যায় ভবিষ্যতের ভ্রূণ।

দায়িত্বের অনিবার্য শ্রান্তি নিয়ে
সুর তোলে
সবুজ বৃক্ষময় প্রাকৃতিক নারী—
গর্বিত।

তিষ্যা আমার এক শিষ্যার নাম

শিলাদিত্য চক্রবর্তী

মর্ত্য—ক্লাইম্যাক্সে অর্বাচীন কোন নারী
যে দাঁড়িয়ে আছে চোরা সোঁতার হারানো জলজঙ্গলে,
নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে উচ্চারণ করে
মহিম্ন স্তোত্র—'প্রেম নেই'।
ঢ্যাড়া পেটাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বাজনদার,
যার গেরুয়া বসন থেকে চুঁইয়ে পড়ে লম্পট
কালোঘাম,
বেহড় উপদ্রুত বেহড় থেকে উঠে আসে দস্যুসর্দার,
সে ছড়ি ঘুরিয়ে মেপে নেয় অভিমানী লাম্পট্যকে।
সৈনিক অগ্রগামী সৈনিক! ব্যারাক সঙ্গীহীন,
মৌতাত বিষণ্ন মৌতাতে যাপনের কালঘাম ছুটে
গেলে মল্লারভেজা গান শুনি,
অশ্বিনস্নাত বৃহন্নলা! বিভ্রান্ত ডাহুক ডাহুকীর
স্বপ্ন নিয়ে আমাকে ঘুমোতে দাও,
পোয়াতি রাতে অশক্ত উদ্যমে।
সুঘ্রাণ অন্ধকারের দিনে আজগুবি এক কথা শুনি,
জ্যামিতির বক্র রেখাই মনের মৃত্যুর কারণ,
আঃ! সেই কাঠ কয়লা আর বার্চ গাছের অনুষঙ্গ গুয়েৰ্নিকাতে
এসে মেলে কোন সন্ধিক্ষণে।
প্রান্তশিরায় উঁচু গলায় কথা বলার দায় কারও নেই,
জন্মান্ধকার থেকে দেওয়াল ফুঁড়ে আসে দেওয়াল,
গলিত দেওয়াল! সর্পিল-দেওয়াল! আলো নেই! আলো নেই!
দেওয়াল ক্রমে বাড়ে দেওয়াল, ইঁট গাঁথা হয় ইঁট,
তিষ্যা আনাঘ্রাতা তিষ্যা এবার বলি,
'নারী' বল্লে আগুন দেবে না?

তবু আমি ভালোবাসি, (স্বরসঙ্গতিতে)

যশোধরা রায়চৌধুরী

অতঃপর অলসতা, ছলচ্ছল নদের মতন অন্তরতঃ
পরম মন্থর সব কথন, বক্তব্য ষড়দর্শনসম্ভব,

অক্ষমের ভালোবাসা ; আক্ষুটে সারা রাত রাজার প্রাসাদ
আঁচড়িয়ে হাহাকার—শার্শি-আবদ্ধ তার হাভাতে পরাণ। হায়, জানালার বাহিরে আঁধার !

ই কি রীতি ! বীতশ্রদ্ধ পীরিতির কিমিতি বিলাপ ?
বিতিকিচ্ছিরি শুীতে বিকেলে পিচেশ সূর্য দিনান্তের পিঁড়িতে আসীন

ঘুলঘুলি ক্ষুদ্রতর, শুধু খুঁজে উপলে উৎপল তার হৃদি উচাটন
নিরুপায়। হুলুস্থুল শুধু যুঝে লুব্ধের উদ্দেশে, যুদ্ধে হেরে····

এখানে দেওয়াল উঁচু। এখানে মেজর প্রেমিসের
স্বেচ্ছাচার। এলেবেলে ছেলেখেলা বেড়াল থলির বাইরে ছেড়ে

পড়োশীর রৈ রৈ চীৎকার। বৈরাগীর খোঁজাখুঁজি চূড়ান্ত, সে ভৈরবী সঙ্গত। সে সঙ্গতি
তৈরী করা তবু বড় অসম্ভব ; জীবনের বৈশ্বরী শাসন বৈ তো নয় !

তোমাকেই তবু খোঁজা। ওগো নিরুপমোত্তম, এসো, নয়তো ওলাউঠো হোক—
ওজর শুনছি না, তুমি গোচরে আসো না কেন ? কি মোচ্ছবে মোতায়েন থাকো ওপরেই !

কৌশল করেছো বড়ো, ঔদার্যের কোনো ফোজই বাকি নেই ছলনায় আমাকে ওল্টাতে
আমারই চিত্তের দৌর্বল্যে তুমি গৌর—তাই কৌমার্যের মুর্খতায় আমি

তবু ভালোবাসি। তবু ভালোবাসি সৌজন্যসংখ্যায়।

কপালে তার ধুলো

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য

একটা বুড়ো, মাঝ নদীতে, নৌকো
বেয়ে বেয়ে.....
যেখানে এই দৃষ্টি-থামা
সেখান থেকে আকাশ ছুঁয়ে নদী

রোজই এমন নৌকো বেয়ে যাওয়া

তোমার আছে, আমার মতো মেয়ে ?
কাঁকন থেকে খোঁপার মালা শিউলি,
কপালে তার ধুলো.....

এমন মেয়ে, আমার মত মেয়ে ?

নদীর ধারে, সারা বিকেল ভোর
বলবো কথা, বলতে গিয়ে থেমে
একটা বুড়ো, মাঝ নদীতে, নৌকো
বেয়ে বেয়ে.....

অজ্ঞাত মৃত্যু

বিবেক সেন

অনুভব ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়েছিল। ভাবছিল গতরাতে সামনের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া মৃতের কথা, মৃত্যুর কথা।

'মৃত্যু মানুষকে জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু জীবনকে হারিয়ে দিতে পারে না। পূর্বপুরুষকে ভুলে মানুষ উত্তর পুরুষের দিকে ফিরে চায়, মৃত সন্তানের শোক মুছে দেয় নবজাতকের হাসি, এইভাবে মানুষ বেঁচে আছে—শ্মশানের পোড়ো জমি চষে, ফসল ফলিয়ে; বাগানের মরা গাছ জঞ্জাল সাফ করে, নতুন ফুলগাছ পুঁতে, প্রতিটি মৃত্যুর পর আবার নতুন আশায় বুক বেঁধে, এতটুকু নিরাসক্ত নিরাশ না হয়ে—মৃত্যু মানুষের আশা, বেঁচে থাকার প্রবণতা কেড়ে নিতে পারে না। মৃত্যু জীবনকে নতুন প্রাণশক্তি জোগায়, জীবনকে সমর্থন করে নিজের নিয়মে।

তবুও মনে হয় কেন যেন—কোথায় কি এক মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে, সে মৃত্যু কেমন জানা নেই, কি ভাবে আসে তাও না। নিষ্ঠুরতম সেই মৃত্যু জীবন থেকে নিংড়ে নেবে সব আশা, সব স্বপ্ন আর ছুঁড়ে ফেলে দেবে তার শিকারকে। বীভৎস সেই মৃত্যু অথচ মৃত্যুও নয় যেন। সাধারণ মৃত্যু—জীব বিজ্ঞানের মৃত্যুর এত অন্ধকার রূপ নয়, বৌদ্ধ নির্বাণের মতো সাধারণ মৃত্যুর ওধারে আলো নেই, অন্ধকারও নেই, আশা নেই, হতাশাও নেই, ঘুমের মতো দুঃখও অনুপস্থিত। শুধু আশ্চর্য সুস্থিতি আছে, শারীরিক মৃত্যু যেন দার্শনিকদের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ, মানুষের জেগে থাকা, ঘুমনো, কাজের ভেতর যে চূড়ান্ত লক্ষ্য রয়েছে, সেই লক্ষ্য। অথচ এই অন্য মৃত্যু তা নয়; বিশাল, অন্ধকার, লোলুপ তার মুখ—ভাবা যায় না, বুঝে ওঠা যায় না, শুধু স্বপ্নের ভিতর মাঝে মাঝে টের পাওয়া যায়। তাই বোধহয় কেউ বলে না এর কথা, হয়ত ভয় পা।, হয়ত ভাবে সবাই হেসে উঠবে, এমনও হতে পারে প্রত্যেকেই জানে এর কথা, তবু চোখ ঠেরে থাকে, ভেবে নেয় এই মৃত্যু তোলা আছে অন্য কারো জন্য, তার জন্য নয়, সাধারণ মৃত্যুকে গন্তব্য রেখে তারা হাসে, গান গায়, প্রেম করে, মালা গাঁথে। প্রত্যেকেই ভাবে অন্য কারো জন্য এই মৃত্যু, কিন্তু কার জন্য, আমরা কেউ জানি না কার জন্য। সে কি ভাবে জীবন কাটায়? সে কি বিবাহিত? কারো বাবা বা মা? ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? আমরা জানি না সে হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ কি না জানি না, এই ভবিষ্যত মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে সে জানে কিনা, জানলেও কি ভাবে নেয় তার স্থির গন্তব্যকে?

আমরা কোন বিজ্ঞানের সূত্র বা দার্শনিক পন্থা না পেতে পারি এসব জানতে কিন্তু যদি প্রতিটি মানুষের জীবন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়—সে কে, তার শৈশব কেমন ছিল, যে ঘরে তার মা তাকে শুইয়ে রাখতেন তার জানালা দিয়ে কি মাঠ, আকাশ আর পথ দেখা যেত—এই সব, শৈশব, কৈশোর, বাল্য নিয়ে অনেক অনেক খুঁটিনাটি, ব্যক্তিগত কথা, স্বপ্ন, ইচ্ছা; তবে কি খুঁজে পাব না এই বিচিত্র মানুষের ভিড় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তি আর তার অজ্ঞাত মৃত্যুর স্বরূপ……।

অনুভব জীবনের ছত্রিশটা বছর কাটিয়েও খুঁজে পায়নি তার প্রার্থিত সেই মৃত্যু, আশা হতাশার আলো অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়েছে এক দিকভ্রষ্ট বাদুরের মতো, আলোর গৌরবে দাঁড়িয়ে মনে করেছে অন্ধকার শুধু এক বুদ্ধির ভ্রম, তবুও কখন মনের খেয়ালে তার উদ্‌ভ্রান্ত পথচলা তাকে দাঁড় করিয়েছে অন্ধকারে, নিয়ে এসেছে আবার আলোয়। বৌদ্ধ দর্শনের আত্মার জন্ম-মৃত্যু-চক্র যেন নেমে এসেছে ছত্রিশ বছরের এই একক জীবনে, আশা-হতাশারা তাকে নিয়ে বারবার এক খেলা খেলে যাচ্ছে। ক্লান্ত বোধ করে অনুভব—জীবনে সুস্থিতি চায়, অন্ধকারে অথবা আলোয়, তবুও

জীবন তাকে শান্ত নুড়ির মতো পড়ে থাকতে দেয় না। ডোবার ঘোলা জলের নিচে, তাই শুধু এক গহন মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে তার বুদ্ধি ও হৃদয়, এই জীবন কোন তীর্থযাত্রা নয় আর তার কাছে ; শান্তি চায় অনুভব, হৃদয়ের স্থবির পড়ে থাকা যে কোন রকম স্থির চীনামাটির পাত্রে। আশার সে হৃদয়ে স্পন্দন জাগাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাক, হতাশাও। আসলে হতাশা তো আরেক রকম আশা, হতাশায় দুঃস্থ প্রত্যাশী মন জেগে থাকে আশার প্রতীক্ষায়, তাই তারা দু'জনেই চলে যাক, শুধু যেন মৃত্যু থাকে তার শীতল শরীরে, মনে। অনুভব মরে যেতে চায়।

ঘড়ির ঘণ্টার শব্দে লাফ মেরে ওঠে বিছানা থেকে। সাতটা নির্দিষ্ট পরিমিত শব্দ, তবুও তার সাথে এ মুহূর্তে আরও কিছু অসুন্দর শাদামাটা প্রাত্যহিকতা জড়িয়ে রয়েছে। ওকে এখন দু'ঘণ্টার মধ্যে গতকালের বাসন মাজতে হবে, রান্না করতে হবে, স্নান করে, খেয়ে, বিশাল, প্রায় পরিত্যক্ত এই বাড়ির কয়েকটা দরজায় তালা ঝুলিয়ে শহরতলী থেকে দমবন্ধ ভিড়ের ট্রেনে রওনা দিতে হবে ক্লান্তিকর শহরের বেসরকারী অফিসে কলম পেষার জন্য। এই মুহূর্তটাকে সে সবচেয়ে ঘৃণা করে। জীবনের অর্থহীন অনুষঙ্গ তার চিন্তাকে, তার একমাত্র সান্ত্বনাকে যখন কেড়ে নেয়, সে সময় জীবনের কাছে নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হয় অনুভবের।

স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে জীবন ও মৃত্যুই এই আশ্চর্য পৃথিবী নিয়ে আরো কিছুদূর ভেবে দেখল অনুভব। গতকাল অনেক রাতে যে মানুষটাকে হরিধ্বনি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, তার এই মৃত্যু কিংবা তার অতীতের জীবন কোন সত্যকে তুলে ধরে না যেন, মরে যাওয়া মানুষটার বিরক্তিকর অস্তিত্ব, প্রেমহীন বেঁচে থাকাকে শ্রদ্ধা জানাতে কেউ তার সাথে সহমরণে যাবে না, জীবিতেরা কোনদিন মৃতদের সঙ্গ দেয় না, দুজনের পৃথক উপাস্য দেবতা রয়েছে। আর এই আত্মকেন্দ্রিক বেঁচে থাকা জীবনকে নিয়ে এসেছে নিচুতে, মৃত্যুকে কাম্য করে তুলেছে, মহিমামণ্ডিত করেছে, তবুও মানুষ স্বার্থপর জীবনকে ভালবাসে, মৃত্যুকে ভয় পায়, ঘৃণা করে। অথচ তবুও মানুষ চাইল না প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে যেতে, চাইল না মৃত্যুকে পরাজিত করে জীবনের বন্ধ্যা জমিতে শস্য ফলাতে। মৃত্যুই যেন জয়ী হয়ে গেল আর সে সত্য উপলব্ধি করে আশা হতাশার গোলক ধাঁধাঁয়, ইতিহাসের রক্তাক্ত গলিঘুঁজিতে পথ হারিয়ে ফেলল অনুভব। মৃত্যুর দাম্ভিক পদধ্বনি তাকে প্রতিমুহূর্তে নির্মম ভাবে তাড়া করে চলে। ইতিহাসের ভ্রাতৃহননের ভিতর সত্য মিথ্যার উপলব্ধি হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। হারিয়ে ফেলেছে বর্তমানের প্রশ্নে ভবিষ্যতকে, শ্রেণীর প্রশ্নে ব্যক্তিকে। আর তাই এক অদ্ভুত নীতিহীন, চিন্তাহীন রক্তোৎসবে মাঝে মাঝেই মেতে উঠছে, রক্তের নদীকে পুষ্ট করছে, রক্তনদী পুষ্ট করছে ইতিহাসের ঘাতক প্রবণতা—বসনোডিয়ায়, চীনে, আফ্রিকায়, আমেরিকায়। অনেক ঘটনা ঘটে গেছে পৃথিবীতে, অনেক শোকাবহ ঘটনা। তবুও মানুষ আজ আশ্রয় চাইছে না কোন সহিষ্ণুতায়, বিশ্বাসে। কোন এক যুবক তার প্রেমিকাকে ট্রেনের সামনে ফেলে দিয়েছিল, সবাই দেখতে এসেছিল সেই রক্তাক্ত মৃত দেহের নগ্নতা, মৃতার জন্য কাঁদেনি কেউ। বিশেষ কিছুই আর স্পষ্ট নয়, পথ সব হারিয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন জটলার চীৎকার ও সংঘর্ষের ভিতর। আর তাই মনে হয় প্রগতি, বিপ্লব, রাষ্ট্র, জাতি সব শব্দ একই কথা বলে, প্রতিটি সামাজিক শব্দই রক্তমাখা, ইতিহাস নামের অন্ধকার ঘরে শুধু হাহাকার আর মৃত্যুর শীতল, নিষ্ঠুর হাসি।

ভিড়ের ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়েছিল অনুভব, রেল লাইনের দুপাশের বস্তির বাড়িগুলোর ওপর থেকে এখনো কুয়াশা সরে নি, ঝাপসা, বিমর্ষ ঘরগুলোর সামনে কুয়াশা মানুষেরা হাঁটাচলা করছে, ছোটাছুটি করছে বাচ্চার দল, কাগজে দাঁড় পেঁচানো বল দিয়ে খেলছে, রেল লাইনের পাশেই ম্যাড়ম্যাড়ে রোদে বসে আছে মেয়েরা। সবুজ পুকুরে স্নান করছে, কাপড় কাচছে, কাপড় ছাড়ছে শ্যাওলা পড়া উন্মুক্ত পাড়ে দাঁড়িয়ে। হারমোনিয়ামের শব্দ শুনে সে কম্পার্টমেণ্টের ভেতর তাকায়, অন্ধ ভিখিরী শীর্ণ হতে ভাঙ্গা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে আর তার সাথের ছেঁড়া ফ্রক পরা, লাল রুক্ষ চুল, খড়ি ওঠা, রক্তহীন শাদা মেয়েটা হাতের কৌটো এগিয়ে দিচ্ছে এদিক ওদিক একটা মধুর শব্দের প্রত্যাশায়।

বসন পর মা গো,
বসন পর মা,
চন্দনে চর্চিত জবা তোরে দিব আমি গো···

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কাঁচা টাকা বার করে হাতের মুঠোয় রেখে শৈশবে দেখা দৃশ্যটা ভাবতে থাকে অনুভব অতীতের বহুবারের মতো, শেয়ালদায় আস্তাকুঁড়ের পাশে অর্ধনগ্ন ভিখিরী মা তার ছেলেকে এঁটো হাতে নির্মমভাবে মারছে আর ভাঙা জংধরা একটা ক্যান থেকে তুলে জিভ বার করে খাচ্ছে পিণ্ড পাকানো পচা ভাত। ঘৃণায়, শোকে মানব জীবনকে রক্তজবাটা আর দেওয়া হল না অনুভবের।

ভারী টাকাটা কৌটোয় পড়ে একটা ভোঁতা শব্দ করে আর ক্লান্ত শূন্যতা ছড়িয়ে দেয় অনুভবের চিন্তায়। শেয়ালদা স্টেশানের নানা রঙের পোস্টার আর মাইক্রোফোনে বাজানো রাজনৈতিক আশ্বাস তার সে শূন্যতাকে অতিক্রম করতে পারে না।

দুটো পরস্পর-বিরোধী টানে সে ছিঁড়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে। একদিকে তার ব্যক্তিগত পশুসত্বা, তার অ্যামিবা সত্বা তৃপ্তি চায় মাংসপিণ্ডের, অন্যদিকে বুদ্ধি ও হৃদয় চাইছে সুদ্ধ আত্মার মতো কিছু অবাস্তব হয়ে উঠতে। কিছু একটা হয়ে যেতে পারলে সে বেঁচে যেত, কিন্তু এখানেই তার দুর্ভাগ্য যে সে কিছু হতে পারে নি সারা জীবনে—ভাল ছাত্র নয়, কবি নয়, প্রেমিক নয় এমন কি কামুক অথবা একদম স্রোতে গা ভাসানো শূন্য মানুষও নয়। সে ভয় পায় শিশ্নোদর পরায়ণ জীবন, সে জীবন যদি তাকে শান্তি না দেয়, তার বুদ্ধি যদি ক্রমাগত নিজেকে চাবুক মারে, তবে! মস্তিষ্কে সংসার, স্বাচ্ছন্দ্যের উষ্ণতার কথা সে ভেবে দেখেছে কিন্তু প্রেমিক হওয়ার, পিতা হওয়ার দায়িত্ব তার পক্ষে বড় ভারী, এক সংক্রামক রোগে তার চেতনা আক্রান্ত, সে তার সন্তানকে যদি এই ব্যধি তুলে দেয়, তবে? প্রেম তাকে আহ্বান করেছে, কিন্তু এক পরাজয় আশঙ্কায় তাকে পিছু হটতে হয়েছে, প্রেম দাবী করে তার সমগ্র অস্তিত্ব, চেতনা; যে পৃথিবীকে অনুভব অসমাধানযোগ্য কোন গাণিতিক হেঁয়ালি বলে জানে তার এক অপার্থিব, ঐশ্বরিক সমাধান প্রস্তাব করে প্রেম, হৃদয় ভয় পায় সেই সমাধানকে, ভয় পায় প্রেমের এই সর্বগ্রাসী প্রস্তাবনাকে। যদি তাকে ভোলাতে না পারে এই রঙিন বুদবুদ তবে তাকে হয় নেমে যেতে হবে চিন্তাহীন বুদ্ধিহীন পশুর জীবনে অথবা আত্মগ্লানিতে তুলে নিতে হবে ধারালো ক্ষুর—মরে যেতে, এই ভাবে মরে যেতে ক্লান্ত বোধ করে অনুভব। তবুও জীবন যাপন ও তার বিচিত্র মঞ্চে, বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির মধ্যে বেঁচে থাকতে অভ্যাস করতে হবে তাকে আর কেউ তাকে তা শেখাবে, এই এক আবছা, দোদুল্যমান বিশ্বাস আছে বলেই হয়ত তার কিছু স্বপ্ন আজও যেন রয়ে গেছে। তবুও কখনো কখনো অনুভব টের পায় এই বিশ্বাসও তার জীবনযাপনের মতো অন্ধকার—আলোর ক্লান্ত চক্রে আটকা পড়া, আর তখন সে যাঁতা কলে পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করে, ব্যস্ত হয়ে ওঠে একটা পথ খুঁজে নিতে। তার জীবন শুধুই এক অবাস্তবতায় ডুবে থাকা ধাঁধাঁ।

আর এইসব দার্শনিক মনস্তাত্ত্বিক গোলকধাঁধাঁর ভেতর সে হারিয়ে ফেলেছিল শাশ্বতীকে। হয়ত কখনো ওকে সত্যিই ভালবেসে ছিল, কিন্তু কেন যেন অনুভূতিগুলো উত্তাল নদীর মতো অশান্ত, ঝোড়ো বাতাসের মতো ঝরঝর শনশন্ শব্দের ভেতর বয়ে যায়, তাড়িয়ে আনে বিভিন্ন রংয়ের মেঘ—গভীর শ্রদ্ধার পরের মুহূর্তে কুঁকড়ে যায় ঘৃণায়, কখনো একটা অবজ্ঞা, নিতান্ত নিরুত্তেজ নিরপেক্ষতার সাথে অনুকম্পার বিচিত্র সংমিশ্রণে জীবনকে দেখে, তাই বিশেষ কোন মত, পৃথিবী ও পার্থিব মানুষদের নিয়ে, প্রেম, বিপ্লব নিয়ে, অথবা নিজের আবেগ, বিশ্বাস, প্রতিজ্ঞা নিয়ে বলে ফেলে; আর তাকে সমর্থন করার দায় বোধ করে না। যারা স্থির বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুতে ঠায় আটকে আছে তাদের কখনো কখনো নির্বোধ ঠাউড়ালেও নিজেকেই আজকাল তার হতভাগ্য, আনাড়ি মনে হয়। শাশ্বতীকে ভালবেসে মনে হয়েছিল এক আশ্চর্য সম্ভাবনাময় ঊষার যেন আবির্ভাব ঘটেছে তার জীবনে, দীর্ঘ অন্ধকার রাত তার সাদা ছোট্ট ডানায় ঠেলে সরিয়ে কোন পাখি এসেছে তাকে পথ চেনাবে বলে। শান্ত, বিকেলের রোদের মতো কোমল ও মেয়ের আনন্দ দুঃখের সামান্য, আদর্শনিক ভাবনার মধ্যে অজানা, অচেনা, পাহাড়ী নদীর মূর্ছনা শুনতে পেয়েছিল সেদিনের অনুভব। শাশ্বতীর শৈশব, কৈশোরের যে কথা কেউ বোঝে নি, শুনতেও চায়নি, তা উপলব্ধি করেই যেন জীবনযাত্রাকে মানবিক করে তুলতে ওর ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছিল অনুভব।

কিন্তু শাশ্বতীকে কিছুই গুছিয়ে, বুঝিয়ে বলতে পারে নি, যত সহজে, যত সামান্য শব্দ ব্যবহারে শাশ্বতী তাকে সব বলতে পেরেছিল, তত সরলভাবে অনুভব কিছু বলতে পারে নি। শাশ্বতীর মত অত অকৃপণ, স্বচ্ছন্দ প্রেম

তার মধ্যে ছিল না, আত্মকেন্দ্রিক সুখ, শোকে তাপে সান্তনা তার কাছে অর্থহীন ; বিচ্ছিন্ন অন্যমনা জীবনে আচমকা এসে পড়া শোক তাপ নেই অনুভবের, ঝরনার মতো দুঃখ সব সময় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ করে চলেছে, তাই অনুকম্পার প্রয়োজন তার, শাশ্বতী তা বোঝে নি। তার সুখের শান্তির সাধারণ গণ্ডীবদ্ধ ভাবনার সাথে কিছুতেই একমত হতে পারে নি অনুভব, মানুষের সীমাবদ্ধতা, ঐশ্বরিক বিধান এসব আপ্তবাক্য মেনে জগত সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকেও দু'চার জন মানুষের জন্যে আবেগ বোধ করে, তাদের পুষ্টি ও মেদের কথা ভেবে, অশ্রুবিন্দু ও দীর্ঘশ্বাসে কাতর হয়ে, এক ক্ষুদ্রতার ভেতর স্বার্থপর ভাবে বেঁচে থাকার কথায় সারা শরীর গুলিয়ে ওঠে তার। তবুও শাশ্বতীকে অস্বীকার করতে পারছিল না, হতচেতনার ভেতর ডুবে থেকে তাকেই আশ্রয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর এই অপ্রাকৃত নির্ভরশীলতাও বোঝে নি শাশ্বতী, বোঝে নি বুদ্ধির দহন, মাংসপিণ্ডের গ্লানি। সে শুধু অনুভবকে চেয়েছিল ; বুদ্ধি, হৃদয়, শরীর—অস্তিত্বের কোন অংশের সে আকাঙ্ক্ষা তা না বুঝেই, আদিমতম ভাবে, প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্যে। আর ঘৃণায় ভরে উঠেছিল অনুভবের মন। বুঝিয়েছিল নিজেকে, আমাদের সঞ্চার হয়েছে ক্রোধের মধ্যে, অপ্রেমে। সবাই অপ্রেমে বাঁচব, অপ্রেমে মরে যাব। এই অপ্রেম আমাদেরর শিখিয়েছে পূর্বপুরুষ, সমাজ-সংস্থা, প্রকৃতি।

তবু কি ব্যঙ্গ, যত বেশী অপ্রেম, যত বেশী একজনের সংসার সম্পর্কে ঘৃণা, ততই তার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, ততই মহৎ সংসার, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির স্বপ্ন, এটা কি ব্যঙ্গ নয় ? নিজের প্রতি করুণা হয়েছিল অনুভবের, হাস্যকর মনে হয়েছিল নিজেকে। আশ্চর্য এই ব্যঙ্গাত্মক জীবন ; ক্ষুধা, প্রেম, রিরংসায়, আশা হতাশায়, আর এই আশা-হতাশা, স্বপ্ন, সদিচ্ছা ঠেলে ঠেলে হো হো করে ব্যঙ্গ উঠে আসছে প্রাত্যহিক মলত্যাগ আর খোশপাঁজড়া সাফের সাথে সাথে। শেষ দৃশ্যে কোন ঐশ্বরিক মর্ম উপলব্ধিতে তার বিশ্বাস নেই, সারাজীবন ধরে ঐশ্বরিক বেহালাও কেউ বাজায় না, প্রেমে ও প্রয়াসে তেমন কোন গাঢ় একনিষ্ঠতা মানুষ দেখাতে পারে না, কাজেই তুমুল ব্যঙ্গ ও হাততালির আয়োজন, গম্ভীর নাটকের লঘু দৃশ্যে ভাঁড়ের পাতলুন খুলে পরা। ঘৃণা হল ওর শাশ্বতীকে। নিজেকে ছিঁড়ে নিল ওর কাছ থেকে। তারপর পৃথিবীর এই ক্রমাগত সরল থেকে জটিল, জটিল থেকে জটিলতর নিয়মহীন হয়ে পড়া আর তার মধ্যেকার অর্থহীন, অন্ধ জড় বস্তুর মতো, ইলেকট্রনের মতো ক্লান্ত কক্ষ পর্যটন থেকে দূরে সরিয়ে নিল নিজেকে মফস্বলের নিঃসঙ্গ পৈতৃক বাড়িতে নিস্তব্ধতার ভেতর। মাঝে মাঝে শুধু মনে হত একরাত্রির বাঁধ ভাসা উচ্ছলতা ছাড়া আর কিছু পেল না ও শাশ্বতীর কাছ থেকে।

রায় অ্যাণ্ড মুখার্জীর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ঘুপচি অফিস থেকে বেরিয়ে নিজেকে অনেক মানবিক মনে হয় অনুভবের। পরস্পরের দিকে সবসময় ছুরি উঁচিয়ে রাখা দুই চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যাণ্টের মাঝে পরে জীবন আর তার এই হাস্যকর প্রয়োজনিয়তাগুলো যেন প্রকট হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ীদের নকল খাতা নিয়ে বিভিন্ন sales tax officer-এর সামনে বসে ক্যাসেট প্লেয়ারে হরিনাম সংকীর্তনের মতো প্রতিবার একই প্লীড করা, It's quite unjustified, arbitrary and whimsical to tax our client M/s X-industries In the manner which you followed. এই অদ্ভুত পুনরাবৃত্তিতে, যান্ত্রিকতায় তার হাসি পায়। এ চাকরীতে প্রথম ঢুকে তার মনে হয়েছিল যেন হাইস্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র হয়ে গেছে আবার—জীবনে ব্যবসায়ীদের দুধে জল মেশান, কাপড়ের দাম বাড়িয়ে বিক্রি, এসবের হিসাব করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। এতদিন কাজ করে এ চাকরীর নৈতিক দিক নিয়ে ভাবতে ভুলে গেছে অনুভব, শুধু কষ্ট পায় নোংরা উঁচু ছাদওয়ালা ঘরের ভিড়ে নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে। রায় এ্যাণ্ড মুখার্জীতে অনুভব বলে কোন মানুষ নেই, লিগ্যাল অ্যাডভাইজার মিস্টার সেন আছে, অনুদা আছে, কখনো কখনো ভড়বাবু আছে—কেমন যেন ডানা কাটা, পালক ছাঁটা, শেকল পরা নিরীহ পাখি বলে মনে হয় নিজেকে। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনের অর্থহীনতা প্রমাণ করার জন্যই টিঁকে আছে এমন সব ঘুপচি অফিস—অনুভব শান্তি পায়, তার রায় অ্যাণ্ড মুখার্জীকে ভাল লাগে এমন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভূমিকা পালনের জন্য।

প্রতিদিনের মতো আজও সে মাথার ওপরে ছড়িয়ে থাকা শান্ত, ধোঁয়াটে মুক শেষ বিকেলে হেঁটে যাচ্ছিল রফি আহমেদ কিদোয়াই স্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্ট্রীটের দিকে, প্রতিদিনের মতো দুপাশের জঞ্জাল, মাথায় ফেজ পড়া ভিখিরী, ভাঙ্গা রাস্তায় গাড়ীর লাফিয়ে ওঠা—এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না তার কাছে। শেয়ালদার ভিড় না কমা পর্যন্ত সে

হেঁটে বেড়াবে এই মৃত্যুপথযাত্রী শহরের পথে, উজ্জ্বল আলো, দোকান, মানুষ, সিনেমার গানের মধ্য দিয়ে—যেন ঈশ্বর তাকে সাক্ষী নির্বাচিত করেছেন এই ক্ষয়রোগের। অনুভবের হাসি পেল, 'সাক্ষী'—আসলে সময় কাটানো, যতক্ষণে না ট্রেনের ভিড় কমে আসে। একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখতে লাগল, রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাওয়া মানুষদের। হয়ত এই প্রক্রিয়ায় সব সময়ই দুই ফুটপাথের চলমান জনসমষ্টির সংখ্যা সমান থাকে—কিন্তু এটা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই ; মানুষের ফুটপাথ বদলানো, ওর অবাক লাগল। হঠাৎ খেয়াল করল দূরে দ্রুত রাস্তার অন্য ফুটপাথে হেঁটে যাওয়া একজন মানুষের পদক্ষেপের ভঙ্গি তার চেনা, একদিন যা তার বুকের মধ্যে আশ্চর্য প্রিয় স্পন্দন জাগাতো, যে ভঙ্গি মুগ্ধ চোখে দেখত সে, সেই ভঙ্গি, সেই মানুষ চলে যাচ্ছে, শাশ্বতী। সে ভুলে যাওয়া মুর্ছনা তাকে উদ্ধার করতে পারে এই নরক থেকে, দহন থেকে, যাকে একদিন অস্বীকার করে চলে গিয়েছিল নির্মম মনের খেয়ালে, তাকে শুনতে পেল অনুভব, প্রতিটি শিরায়, ধমনীতে, হৃদয়ে, বুদ্ধিতে।

দ্রুত, এক নিশ্বাসে রাস্তার অন্য ফুটপাথে ছুটে গেল অনুভব, দীর্ঘদিন পরের এই যৌবনোচিত আচরণে অবাক না হয়ে, কোন গাণিতিক নিয়ম না জেনে ; তার হৃদপিণ্ড যেন গলায় এসে আটকে গেছে। ঐ তো হেঁটে যাচ্ছে শাশ্বতী, একবার ওকে হারিয়েছিল নিজের ভুলে, আজ আবার তাকে হারাবার অর্থ মরে যাওয়া। অনুভবের মেরুদণ্ড বেয়ে শীত উঠে এল। না কখনোই হারাবে না আর ওকে।

'শাশ্বতী, শাশ্বতী, স্বাতী'।

হেঁটে যাচ্ছে শাশ্বতী, হারিয়ে যাচ্ছে ভিড়ে। ওকি শুনতে পায়নি অনুভবের ডাক। হয়ত শুনতে পায়নি এত কোলাহলের মধ্যে। অনুভব কি ওকে ডাকেই নি, ভেবেছে ডেকেছে! অনুভব চীৎকার করে উঠল, তার গলায় হারিয়ে যাওয়া যৌবনের কাঁপন, শাশ্বতী, শাশ্বতী। হ্যাঁ, ও নিশ্চয় শুনেছে, কিন্তু এড়িয়ে যেতে চাইছে অনুভবকে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে নিয়েছে, ওর হলুদ শাড়ী ঈষৎ বাতাসে উড়ছে। কেন শাশ্বতী, কেন তুমি চলে যেতে চাইছ, কেন থেমে দাঁড়াচ্ছ না একজনের জন্যে, যে থেমে দাঁড়াতে সবাই যাকে ছেড়ে গেছে। অনুভব জোরে হাঁটতে শুরু করে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের তীব্রতার ভিতর, উল্টোদিক থেকে আসা যুবকের কাঁধে ধাক্কা মেরে, নোংরা জলের ওপর লাফ দিয়ে, যে স্বপ্ন, উদ্যম, প্রয়াস সে হারিয়ে ফেলেছিল সব ফিরে এল এ মুহূর্তে ; সামনে হেঁটে যাচ্ছে শাশ্বতী, ওর নিরাভরণ হাত, ও কি বিয়ে করেনি, ও কি সত্যিই এতদিন প্রতীক্ষায় ছিল অনুভবের ফিরে আসার, তবে এখন কেন পালিয়ে যেতে চাইছে। অনুভব ওকে চলে যেতে দেবে না এমন ভাবে, এমন নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে দেবে না, দুহাতে জড়িয়ে ধরবে, কোন যুক্তি থেকে নয়, হৃদয়হীন পরীক্ষার জন্যে নয়, সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে আশ্রয় চাইবে ওর বুকে, প্রার্থনা করবে, কাঁদবে, 'শাশ্বতী, ক্ষমা কর শাশ্বতী করুণা কর।' এ শহর, জীবন, এমন কি রায় অ্যাণ্ড মুখার্জী হঠাৎ বড় আপনজন হয়ে ওঠে অনুভবের কাছে। যে জীবনকে অস্বীকার করেছে এতদিন, তার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করে এমনভাবে সবকিছু ফিরে দেওয়ার জন্যে। সামনের ঐ নারী যেন তাকে শোক, ক্লান্তি, হতাশার দুর্লঙ্ঘ্য নরক থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জীবনের দিকে। ঋণী মনে হয় তার প্রতিটি ঘাস, পাতা, ধুলো, ঐ জনতার ভিড়, জঞ্জালের স্তূপ, বাতিদানের কাছে নিজেকে। শাশ্বতী, শাশ্বতী। উত্তেজনায় ছুটতে শুরু করে অনুভব, যেন দ্রুত পেড়িয়ে যেতে চায় এই শেষ অন্ধকারটুকু।

দ্রুত ঢুকে যায় হলুদ শাড়ী পড়া প্রার্থিত ছায়া একটা গলির মধ্যে। ছুটে যায় অনুভব গলির মুখে। ঐ তো যাচ্ছে। কিন্তু এটা কানাগলি। এভাবে পালাতে পারবে না শাশ্বতী। ঈশ্বরের ইচ্ছে নয় তা। হারিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাসও যেন ফিরে পায় সে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে।

দুজন মানুষ মুখোমুখি হয়েছে একটা পথের প্রান্তে, পনেরো বছর পর, দুজন মানুষ, যারা পরস্পরকে সব সময় কাছে পেতে চাইত একদিন। দু পাশের উঁচু বাড়িগুলো শব্দহীন, ছায়া ঘেরা, পাশের রোয়াকে শুয়ে থাকা কুকুরটাও মুক, ঝুল বারান্দা থেকে শুকতে দেওয়া কাপড়ও নড়ছে না এ মুহূর্তের গাম্ভীর্যে। অনুভবের সামনে শাশ্বতী, তবু তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে, চোখ জলে ভরে ওঠে। দুহাতে ওর শাদা, মলিন হাত চেপে ধরে অনুভব।

কথা বলতে গোটা মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে ওঠে,

'শাশ্বতী, তোমার মুখ ?'

বাঁ হাতের শীর্ণ আঙ্গুলে তুলে ধরা আঁচলে ধীরে ধীরে তার মুখের দগ্ধ, বিকট বাঁ পাশ ঢেকে নেয় মেয়েটি। মৃত্যুর মতন, স্থির শীতল শব্দ ভেসে আসে অনুভবের কানে। 'আমার স্বামী তাঁর নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন।'

এক মুহূর্তে সমস্ত শূন্য হয়ে যায়, গোটা পৃথিবীর মত, বন্ধ্যাভূমি, উত্তাপহীন অন্ধকার। অনুভব খেয়াল করে না তার হাতের শিথিল মুঠোর থেকে একটা হাত ধরে নিজেকে ছাড়িয়ে গলি পেরিয়ে, রাস্তা, ভিড়, মানুষের বেঁচে থাকার দারুণ সংগ্রাম অতিক্রম করে চলে গেল। অনুভব দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, কুয়াশাভরা কানাগলির ভেতর, চিন্তাশক্তিহীন, চলৎশক্তিহীন, শীতল। আশে-পাশে আলো জ্বলে উঠল, মানুষেরা ফিরে এল বাইরের ক্লান্ত থেকে ঘরের উষ্ণতায়। অনুভব দাঁড়িয়ে রইল, তার আর যাওয়ার মতো কোন আশ্রয় নেই পৃথিবীতে।

এই মৃত্যুই তো তুমি খুঁজেছিলে অনুভব, একা অন্ধকার এই মৃত্যু, যার গাভীর্যে ম্লান হয়ে যায় সবকিছু যার কাছে জীবন সম্পূর্ণ পরাজিত। প্রেমিকের মতো আগ্রহে খোঁজনি এই মৃত্যু, যার সাথে মিলনের পর অন্ধকার ছাড়া আর কিছু থাকে না, আশার পুনঃপ্রবেশ থাকে না, তবে ; দেরি করছ কেন, এই অন্ধগলির মধ্যে এ মুহূর্তে তাকে আলিঙ্গন কর দুহাতে, আনন্দ কর তোমার আকাঙ্খিত মৃত্যুর সাথে মিলনের সৌভাগ্যে।

অন্ধকারে গুঙ্গিয়ে ওঠে অনুভব, 'শাশ্বতী, শাশ্বতী,.....।'

কলকাতার রূপান্তর

অতীন্দ্রমোহন গুপ্ত

দক্ষিণবঙ্গের যে-অংশটিতে আজকের মহানগরী কলকাতার অবস্থান, তিনশ' বছর আগে তাকে সুন্দরবনেরই অংশ হিসেবে মনে করা যেত। সুন্দরবনে যে-ধরনের জলাজমি রয়েছে, সেখানে যে-ধরনের ঝোপঝাড় ও গাছপালা দেখা যায় বা সেখানে যে-প্রকারের বন্যপ্রাণী বিচরণ করে, তার থেকে বিরল-বসতি এ-অঞ্চলটির জমি, গাছপালা বা বন্যপ্রাণীদের প্রকৃতিগত তফাৎ ছিল না।

সবারই জানা আছে যে ইংরেজ আমলে প্রথম দিকে সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে শহরটা গড়ে ওঠে।

সুতানুটি ছিল তন্তুবায়-অধ্যুষিত মোটামুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ভাগীরথীর এদিকটার গভীরতার কারণে জাহাজ বা বড়ো নৌকো এখানে এসে নোঙর ফেলত। আর তাই সুতানুটি সুতি বস্ত্র এবং কাপাসি সুতোর বাজার হয়ে ওঠে। ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট জব চার্নক জনা ত্রিশেক সৈন্য ও কয়েকজন পারিষদ নিয়ে এখানে এসে জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন।

নদীতীর থেকে একটু দূরে, সুতানুটির দক্ষিণে, ছিল কলকাতা—এ-অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু এলাকা। পরে এটিই শহরের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠল। আর পুরো মহানগরীর নামও হল কলকাতা। এ-গ্রামটির উত্তরাংশ বাজার কলকাতা (পরে যার নাম হল বড়বাজার) এ-দেশীয় বাজার এলাকা হিসেবে আগেই খানিকটা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এর দক্ষিণাংশ ডিহি কলকাতা (পরবর্তীকালের ডালহৌসি এলাকা বা বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ এলাকা) কোম্পানীর ঘাঁটি হিসেবে নির্বাচিত হল। ১৭৪২ সালেও ইংরেজদের এই এলাকাটির আয়তন ছিল মাত্র চার বর্গ কিলোমিটারের মতো। এর পূর্ব সীমানা ছিল চিৎপুর রোড আর দক্ষিণ সীমানা চাঁদপাল ঘাট থেকে লবণ হ্রদ পর্যন্ত প্রসারিত খাঁড়ি বা খাল (creek)। লবণ হ্রদ থেকে আরম্ভ হয়ে এটি বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার এলাকায় এসে বাঁয়ে ঘুরে ধর্মতলা স্ট্রীট এলাকার দক্ষিণ দিক ধরে আবার ডাইনে মোড় নিত ; শেষে ওয়াটার্লু স্ট্রীট ও ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া স্ট্রীটের মাঝামাঝি এসে বাঁয়ে ঘুরে পরবর্তীকালের গভর্নমেণ্ট প্লেস নর্থ ও হেস্টিংস স্ট্রীট ধরে ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ত। আজকের দিনের ক্লীক রো এর স্মৃতি বহন করছে।

তৃতীয় গ্রামটি অর্থাৎ গোবিন্দপুর ছিল সুতানুটির মতোই নদীর গা ঘেঁষে, কিন্তু বেশ খানিকটা দক্ষিণে। বর্তমানকালের ফোর্ট উইলিয়াম ও এসপ্লানেড এখানটাতেই গড়ে উঠেছে। এ-গ্রামটির চারদিকে, অর্থাৎ আজকের ময়দান জুড়ে, ছিল ঘন ঝোপ ও বিরাট বিরাট সুন্দরী গাছের বন। জঙ্গলের ভেতরে অসংখ্য ছোট খাল ছিল—নদীতে জোয়ার এলে খাল দিয়ে কাদাটে ঘোলা জল ঢুকে পড়ত, আবার ভাঁটার সময়ে এর সঙ্গে খানা-খন্দের নোংরা জল বেরিয়ে গিয়ে নদীতে পড়ত।

ইংরেজরা তাঁদের এলাকায় একটা দুর্গ বানালেন, এলাকা ঘিরে একটা প্রাকারও তৈরি করেছিলেন। সেখানে বেশ পরিকল্পনা-মাফিক পাকা বাড়ি, রাস্তাঘাটও তৈরি হল। পানীয় জল সরবরাহ হত লালদীঘি থেকে। মাটির নিচে বড়ো পাইপ বসিয়ে নদী থেকে শহরের মধ্যে জোয়ারের জল ঢোকানোর ব্যবস্থাও ছিল। শহরের নর্দমার ময়লা এ-জলের তোড়ে সরে গিয়ে 'ক্লীক'-এ পড়ত। কিন্তু এদেশীয় মানুষ যে-এলাকায় থাকতেন সেখানে—অর্থাৎ শহরের উত্তরাংশে ও দক্ষিণের গোবিন্দপুরে—বাড়িঘর তৈরি হত অধিকাংশই মাটির দেয়াল ও খড়ের চাল নিয়ে। রাস্তাঘাট

তৈরিতেও পরিকল্পনার বিশেষ বালাই ছিল না, তাদের সংখ্যাও ছিল অত্যল্প। আর অপেক্ষাকৃত জনবহুল ও অপরিচ্ছন্ন ছিল এ এলাকাটি। কিপ্‌লিং লিখেছেন—"As the fungus sprouts chaotic from its bed,/So it spread, Chance directed, chance erected, laid and built / On the silt," তা মুখ্যত এই ভারতীয় এলাকাটির কথা মনে রেখেই লিখেছেন।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল···রাজদণ্ড রূপে"। ইংরেজরা শাসনভার হাতে নিয়ে কলকাতা শহরের খানিকটা সম্প্রসারণ ঘটালেন। গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের বাজার কলকাতায় সরিয়ে নেওয়া হল। সেখানকার জলাজমি ভরাট করে, জঙ্গল কেটে বানানো হল ময়দান, এসপ্ল্যানেড ও নতুন ফোর্ট উইলিয়াম। এবার ইংরেজদের এলাকা চৌরঙ্গীর পূর্বাংশে প্রসারিত হল। এদেশীয়দের এলাকা, অর্থাৎ শহরের উত্তরাংশও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে আঠেরো শতকের শেষে প্রায় আপার সার্কুলার রোড পর্যন্ত বিস্তৃত হল। (বর্গীদের আক্রমণ থেকে শহরটাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ১৭৫২ সালে মারাঠা খালের খনন কার্য আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত সাত মাইলের মধ্যে মাইল তিনেকের খনন সমাপ্ত হলে দেখা গেল বর্গী আক্রমণের আর সম্ভাবনা নেই। তাই এ-প্রকল্প পরিত্যক্ত হয় এবং ১৭৯৯ সালে খাল খুঁজে ফেলে তার গতিপথ ধরে সার্কুলার রোড তৈরি হল।)

এভাবে আঠেরো শতকের শেষে কলকাতা শহরের আয়তন দাঁড়াল প্রায় ২০ বর্গ কি. মি. আর তার জনসংখ্যা হল দু'লক্ষের মতো। মনে রাখতে হবে ১৭০৪ সাল নাগাদ শহরের মোট আয়তন ছিল ৬.৮ বর্গ কি. মি. আর জনসংখ্যা তখন ৩০ হাজারের মতো।

ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে লটারি করে টাকা তোলা হল আর তা-ই দিয়ে টাউন হল তৈরি হল, তৈরি হল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, হেয়ার স্ট্রীট, আর্মহার্স্ট স্ট্রীট, প্রভৃতি বেশ কয়েকটি বড়ো রাজপথ। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে এল। কলকাতা তার পরও আয়তনে ক্রমশ বেড়েছে যদিও বর্তমান শতকের শুরুতেই দেশের রাজধানী হিসেবে দিল্লিকে বেছে নেওয়া হল। ১৯০১ সালের আদমসুমারির আগেই শেয়ালদা, বেনেপুকুর, এন্টালি, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, আলিপুর ও খিদিরপুর কলকাতা শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ১৯২১-এর আদমসুমারি পর্যন্তও মানিকতলা বা কাশীপুর-চিৎপুর অঞ্চল শহরের বাইরে ছিল। টালিগঞ্জকে শহরের অংশ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে ১৯৬১-র জনগণনা থেকে। গার্ডেনরীচকে ১৯৩১ সালে শহরের অংশ বলে ধরা হয়, কিন্তু তার পরের জনগণনার সময় এ-এলাকাকে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৮১-র পর অবশ্য গার্ডেনরীচ ছাড়াও যাদবপুর ও বেহালাকে শহরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৮১-র হিসেব অনুসারে কলকাতার আয়তন ছিল ১০৪ বর্গ কি. মি. আর লোকসংখ্যা ছিল ৩৩.০৫ লক্ষ। কিন্তু গার্ডেনরীচ, বেহালা ও যাদবপুরের অন্তর্ভুক্তির ফলে মহানগরের আয়তন দাঁড়িয়েছে ১৭১ বর্গ কি. মি, আর ১৯৮১-র গণনানুসারে এ পুরো এলাকার লোকসংখ্যা ছিল ৪১.২৭ লক্ষ।

কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানকালে জল, স্থল ও আকাশ তিন দিক থেকেই পূর্ব ভারতের প্রধানতম বাণিজ্যকেন্দ্র এটি।

দেড়শ' বছর আগেই শহরের ভেতরে আর মাটির বাড়ি রইল না, পরিবর্তে উঠল ইঁট-সুরকি-সিমেন্টের পাকাবাড়ি। সাম্প্রতিক কালে তো অনেক সু-উচ্চ অট্টালিকা শহরের বিভিন্ন অংশে নির্মিত হয়েছে। কাঁচা রাস্তার স্থান নিয়েছে পিচ-সিমেন্টের পাকা রাস্তা। অনেক পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে, দু'টি বড়ো স্টেডিয়ামও জুটেছে কলকাতাবাসীর কপালে। গাড়ী-বাস-ট্রামের সংখ্যাও বেড়েছে। রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ, চক্করেল ও মেট্রোরেলের সাহায্যে যানবাহন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। পৌর নিগম জঞ্জাল অপসারণ ও পানীয় জল সরবরাহের মতো অপরিহার্য পরিসেবার দায়িত্ব নিয়েছেন। সিনেমা, থিয়েটার, দূরদর্শন এবং বটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, প্ল্যানেটেরিয়াম ইত্যাদির কল্যাণে কলকাতাবাসীর বিনোদনের ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত হয়েছে।

এভাবে আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অনেকাংশে কলকাতার চাকচিক্য বেড়েছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-শহরের কথা লিখতে গিয়ে ঊনিশ শতকের প্রথমে কিপলিং যে বলেছিলেন "*Palace, byre, hovel—poverty*

and pride/Side by side." সে-উক্তির যাথার্থ্য এখনও হ্রাস পায়নি। এখনও দেখা যাবে সু-উচ্চ হর্ম্যরাজির পাশেই বস্তি, রাজপথের দু-ধারের ফুটপাথে কুৎসিৎ দোকান বা ঝুপড়ির সারি।

॥ দুই ॥

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত কলকাতা শহরে জন্মহার ও মৃত্যুহার দু-ই খুব বেশি ছিল। তবে জনসমষ্টিতে নারীদের সংখ্যাল্পতা হেতু প্রজননের মাত্রাধিক্য সত্ত্বেও সার্বিক জন্মহার (প্রতিহাজার মানুষে জন্মের সংখ্যা) খানিকটা নিম্নমান গ্রহণ করত। জলাজঙ্গলের পরিবেশ ও পৌর ব্যবস্থাদির স্বল্পতার কারণে ম্যালেরিয়া বা আমাশার মতো রোগ এখানে লেগেই থাকত। জলো হাওয়া, জঞ্জাল ও মৃত জীবজন্তুর পচনে আবহাওয়ায় দূষণ ইত্যাদি কারণে একটি মারাত্মক রোগ দেখা যেত, সাহেবরা একে বলতেন "the pucka fever". তাছাড়া মাঝে মাঝে কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিত। দেশে যখন মন্বন্তর দেখা দিত তার প্রকোপ বেশি করেই পড়ত এ-শহরে। "And above the packed and pestilential town/Death looked down."—কিপলিং-এর কবিতার এ-দুটি পংক্তিতে রোগশোকের এক ভয়াবহ পরিস্থিতিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে এ-শতকের তৃতীয় দশক থেকে পৌর ব্যবস্থাদির উন্নয়ন, উন্নততর চিকিৎসাব্যবস্থা এবং সর্বোপরি, নূতনতর জীবনদায়ী ঔষধের আবিষ্কার ও সহজলভ্যতার ফলে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, পরিবার পরিকল্পনার প্রচার ইত্যাদির ফলে কলকাতায় জন্মহারও খানিকটা হ্রাস পেয়েছে।

তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা হয় যে ১৮২০-৩০ নাগাদ শহরে বার্ষিক মৃত্যুহার ছিল (প্রতি হাজার মানুষে) ৬০-এর কাছাকাছি। ১৯৫০ সালে এ-হার ২৪-এ এবং ১৯৮৬ সালে ৬-এ নেমে আসে। ১৯৫০ সালে শিশুমৃত্যুর হার ছিল (প্রতি হাজার নবজাতকে) ২৩৪, ১৯৮৬ সালে প্রায় ৫০। অন্যদিকে জন্মহার ১৯৫০ সালে ছিল (প্রতি হাজার মানুষে) ২৬, ১৯৮৬ সালে প্রায় ২০।

কলকাতার জনসংখ্যা যে ১৭০৪ সালের ৩০ হাজার থেকে বেড়ে ১৯৮১ তে ৩৩.০৫ লক্ষে পৌঁছেছে তার মুখ্য কারণ পরিযাণ (migration)। ইংরেজদের আগমনের আগে এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিলেন চাষী, ব্যাধ, জেলে, তন্তুবায়, দোকানদার বা ছোট ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ। ক্রমে ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয় বণিকরা এলেন, এলেন ব্রিটিশ প্রশাসক, করণিক এবং সামরিক বাহিনীর মানুষ। তাঁদের দরকার হল ভারতীয় বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিদের; দরকার হল আর্দালি-খানসামা, দারোয়ান, গাড়োয়ান এবং দোকানদার-ফিরিওয়ালা শ্রেণীর মানুষ। এভাবে কলকাতার জনসমষ্টির প্রকৃতিতে পরিবর্তন এল। ১৮৩৭ সালে শহরের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ২.৮ জন ছিলেন ইউরোপীয়, ২.১ জন ইউরেশীয় ০.৩ জন আর্মেনীয়, ০.২ জন চীনা, ৫৯.৯ জন হিন্দু, ২৫.৯ জন মুসলিম (তাঁদের মধ্যে অল্প কিছু ছিলেন আরব দেশীয়) এবং অন্যান্য ৮.৮ জন। ১৯৫১ সাল নাগাদ ইউরোপীয়দের সংখ্যা নগণ্য হয়ে পড়ল; দেখা গেল শহরের বাসিন্দাদের শতকরা ৩৩.২ জনের জন্মস্থান কলকাতা, ১২.৩ জনের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের অন্য অঞ্চলে, ২৬.৬ জনের জন্ম অন্য রাজ্যে আর ২৭.৯ জনের জন্ম অন্য দেশে (তাঁদের প্রায় সবাই পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষ)। ১৯৮১ সালে, যখন পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) থেকে শরণার্থীদের আগমন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে তখন, এই শতকরা অনুপাতগুলি দাঁড়াল যথাক্রমে ৭১.৯, ৬.৮, ১৪.২ ও ৭.১। বলা যেতে পারে, এই তৃতীয় গোষ্ঠীর মানুষদের শতকরা প্রায় ৮৬ জন উত্তরের চারটি রাজ্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও ওড়িশা থেকে এসেছেন।

প্রথম থেকেই বহু জাতির মানুষ কলকাতায় এসে বসতি নিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েক দশকে অন্য দেশের মানুষদের আগমন কমে এসেছে, আবার অন্য অন্য রাজ্য থেকে আসা মানুষদের অনুপাতও কমেছে। ফলে, কলকাতা তার পূর্বতন বহুজাতিক রূপটি খানিক পরিমাণে হারিয়েছে এবং ক্রমশ বেশি করে বাঙালিদের—বাঙালি হিন্দুদের—শহর হয়ে উঠেছে।

১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত কলকাতার জনসংখ্যা শতকরা বার্ষিক ০.৬৩ হারে বেড়েছে, ১৯২১ ও ১৯৩১ এর মধ্যে বেড়েছে ১.৪৯ হারে এবং তার পরের দশকে (পূর্ববঙ্গ থেকে বহুসংখ্যায় বাস্তু ত্যাগের পরিস্থিতিতে)

বেড়েছে ৪ ৫৫ হারে। সাম্প্রতিক কালে কিন্তু জনসংখ্যার এ-বৃদ্ধিহার অনেকটাই নেমে এসেছে। ১৯৬১ ও ১৯৭১-এর মধ্যে বৃদ্ধিহার ছিল শতকরা বার্ষিক ০.৭১, আর তার পরের দশকে শতকরা বার্ষিক ০.৫১। কিন্তু ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জন্ম-মৃত্যুর ফল হিসেবে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার হওয়ার কথা ছিল শতকরা বার্ষিক ১.৪-এর মতো। তাই বলা যায় পরিযাণের ফলে জনসংখ্যা কমেছে শতকরা বার্ষিক ০.৯ হারে। এটা ঘটেছে শহরের বেশ কিছু মানুষের বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে—তাঁরা অনেকে পার্শ্ববর্তী উপনগরগুলিতে গেছেন, কিছু চলে গেছেন অন্য রাজ্যে, কিছু বা অন্য দেশে।

পূর্বে কলকাতাবাসীদের অনেকেই ছিলেন জীবিকার অন্বেষণে আসা তরুণ ও মধ্যবয়সী পুরুষ। তাঁদের অনেকে আবার আপন পরিবারের লোকদের দেশের বাড়িতে রেখে আসতেন। এ-কারণে কলকাতার মানুষদের বয়োগত বিভাজন এবং তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতে বেশ খানিকটা বৈকল্য লক্ষিত হত। দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও দেশবিভাগের পর এ-বৈকল্যের মাত্রা খানিকটা কমে এসেছে।

১৯০১ সালে ১৫ বছরের কমবয়সী মানুষদের শতকরা অনুপাত ছিল ২১.৮, ১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সীদের ৭৩.১ এবং ৬০ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের ৫.১। ১৯৫০ সালে এ তিনটি বয়োগোষ্ঠীতে ছিলো শতকরা যথাক্রমে ৬.১,৬৯.৮ ও ৪.১ জন মানুষ। ১৯৮১ সালে এই অনুপাতগুলি দাঁড়ায় শতকরা যথাক্রমে ২৬.২, ৬৭.৬ ও ৬.১।

আবার, ১৮৩৭ সালে প্রতি হাজার পুরুষে নারীদের সংখ্যা ছিল ৫৮৫ জন। নারীদের অনুপাত ক্রমশ কমে ১৯৪১ সালে দাঁড়াল প্রতি হাজার পুরুষে ৪৫২ জন নারী। তারপর থেকে কিন্তু নারীদের আনুপাতিক সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ১৯৫১ সালে ছিলো প্রতি হাজার পুরুষে ৫৭০ জন নারী, আর ১৯৮১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে ৭১২ জন নারী।

কলকাতার মানুষদের সম্প্রদায়গত বিভাজন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার খানিকটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। ১৮৩৭ সালে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৮.২ জন ছিলেন হিন্দু, ২৬.৩ জন মুসলিম, ৫.২ জন খৃস্টান ও ০.৬ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী (তার মধ্যে ০.৩ জন মগ, ০.২ জন কনফুসীয়, ০.১ জন ইহুদী ও ০.০২ জন পার্শী)। ১৯০১ সালে নাগাদ এই চার গোষ্ঠীর অনুপাত দাঁড়াল শতকরা যথাক্রমে ৬৫.৩, ২৯.৫ ৪.৫ ও ০.৭ (এর মধ্যে ০.০৩ জন পার্শী, ০.০২ জন শিখ, ০.৩ জন বৌদ্ধ ও ০.২ জন জৈন)। ১৯৮১ সালে চার গোষ্ঠীর অনুপাত দেখা গেল শতকরা যথাক্রমে ৮১.৯, ১৫.৩, ১.৪ ও ১.৪ (তার মধ্যে ০.৫ জন শিখ, ০.৬ জন জৈন ও ০.৩ জন বৌদ্ধ)।

১৮৩৭ সালে আদমশুমারীতে দেখা গেল কলকাতাবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৫.৪ জন বাংলাভাষী, ৮.৪ জন হিন্দীভাষী, ২০.৪ জন উর্দুভাষী, ৩.৫ জন ইংরেজিভাষী, ১.৪ জন পোর্তুগীজভাষী এবং ১.৯ জন অন্যান্য সকল ভাষার লোক। ১৯৫১ সালে বাংলাভাষীদের আনুপাতিক সংখ্যা হল শতকরা ৬৫.৬, হিন্দীভাষীদের ২০.৩, উর্দুভাষীদের ৬.৭; এ-সময়ে দেখা গেল শতকরা২.৩ জন ওড়িয়াভাষী এবং অন্য সব ভাষার লোক মিলে ৫.১ জন। ১৯৮১ সালে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া ও অন্যান্য ভাষার লোকদের আনুপাতিক সংখ্যা দাঁড়াল শতকরা যথাক্রমে ৫৯.৯, ২৩.২, ১১.১, ১.৩ ও ৪.৫। বাংলাভাষীদের অনুপাত কমেছে মুখ্যত পরিযাণের ফলে—অর্থাৎ এঁদের অনেকের শহর ত্যাগের ফলে। হিন্দি-উর্দুভাষীদের অনুপাত বৃদ্ধির একটা কারণ এ-দুটি ভাষা বলেন এমন অনেক পরিবার কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। উর্দুভাষীদের আনুপাতিক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেছেন অবাঙালি মুসলমানরা এখন পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে নিরাপত্তার আশায় কলকাতায় চলে আসছেন। তবে এ-বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

॥ তিন ॥

কলকাতার বহিঃপ্রকৃতি ও তার জনসমষ্টির রূপ গত তিন শ' বছরে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা আমরা দেখলাম। এবারে অন্য একটি দিক থেকে—শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে—মহানগরীর রূপান্তরের কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

ব্রিটিশ আমলে কলকাতা সারা দেশের শুধু প্রশাসনিক রাজধানীই হয়ে ওঠেনি। ক্রমে এ-শহর শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবেও পরিচিত হল। এ-প্রসঙ্গে কিছু ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ্ ও পণ্ডিতদের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। উইলিয়াম জোন্স্ কলকাতায় এসেছিলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হয়ে। নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত শিখলেন। তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় প্রাচ্যের ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি চর্চ্চার জন্যে ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল এশিয়াটিক সোসাইটি। ডেভিড হেয়ারের ছিল ঘড়ি তৈরি ও মেরামতের দোকান, হঠাৎ তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা বিস্তারের কাজে। কেরী, মার্শম্যান, আলেকজাণ্ডার ডাফ এখানে এসেছিলেন ধর্মযাজক হিসেবে। তাঁরাও ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হলেন। ইংরেজি শিক্ষার সূচনাপর্বে হিন্দু কলেজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবের; তার উচ্চতর বিভাগটিরই পরে নাম হল প্রেসিডেন্সি কলেজ, নিম্নতর বিভাগের নাম হল হিন্দু স্কুল। ক্রমে শহর জুড়ে স্কুল কলেজ স্থাপিত হল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ চিকিৎসা-বিদ্যা ও প্রযুক্তি-বিদ্যার সম্প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল। হাওড়ার শালিমার এলাকায় থাকতেন সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারি লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল কিড। ১৭৮৬ সালে তিনি কোম্পানির কাছে প্রস্তাব দেন, উদ্ভিদ্-বিদ্যার গবেষণার উদ্দেশ্যে বাড়ির লাগোয়া বিরাট জমিতে উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হোক। বটানিক গার্ডেন্স্ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৭৯৩ পর্যন্ত তিনি এর সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন। ক্রমে যাদুঘর ও চিড়িয়াখানাও প্রতিষ্ঠিত হল, প্রতিষ্ঠিত হল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (এখনকার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি)।

বাঙালিবাবুরা প্রথমে ইংরেজ বণিক ও প্রশাসকের বেনিয়ান, দেওয়ান, মুৎসুদ্দি বা স্রেফ দালালের কাজ করেছেন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার দৌলতে তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন আপন সমাজের মানসিক ও আত্মিক উন্নতি বিধানে ব্রতী হলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ একদিকে হিন্দুসমাজের কু-প্রথাগুলি দূরীকরণে মনোযোগী হলেন, অন্যদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাঁদের হাতে একটা স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করল। কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তখন মিল, বেন্থাম, কোঁৎ, কাণ্ট, হেগেলের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। ক্রমে সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাট্য, সিনেমা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কলকাতা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর কলকাতার মানুষ সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, মানবেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র তাঁদের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে সারা দেশকে নেতৃত্ব জুগিয়েছেন। বিবেকানন্দ সমাজসেবা ও দেশসেবার এক নতুন পথ উন্মোচিত করলেন। এ-সবই কলকাতার গৌরবের কথা।

বিগত তিন-চার দশক ধরে কিন্তু কলকাতার শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে, চিন্তার জগতে একটা বন্ধ্যাবস্থা চলেছে। কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে হয়তো এখনও লোককে চমৎকৃত করা যায়। সাক্ষরতার প্রসারে কলকাতার সাফল্যের কথা বলা যায়। ১৯০১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩২.৬ আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১.৫। ১৯৫১-তে এ-সংখ্যা দু'টি দাঁড়াল ৫৮.৭ ও ৪৬.৪, আর ১৯৮১ সালে ৭৩.৫ ও ৬৩.১। (সারা পশ্চিমবঙ্গে তখনও এ-হার ছিল যথাক্রমে ৫০.৫ ও ৩০.৩ এবং সারা ভারতে ৪৬.৯ ও ২৪.৮) আবার, শুধু সাক্ষরতার বেলায় নয়, শিক্ষার প্রায় সর্ব-স্তরেই যে এখন কলকাতার মেয়েরা পুরুষদের কাছাকাছি এসে গেছেন তা নিয়েও আমরা গর্বানুভব করতে পারি। কিন্তু পরিসংখ্যানের আড়ালেও কিছু সত্য লুকিয়ে থাকে, তাদের দিবালোকে নিয়ে আসতে হয়।

এ-শহর থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য, উৎকৃষ্ট চিত্রকলা বা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি আর বেরোচ্ছে না—এ-অভিযোগ অমূলক নয়। কলকাতার শিক্ষাজগতে ফাঁকিবাজি ও উপরচালাকি এখন সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—এটা লক্ষ্য করেও আমরা শঙ্কিত হই। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেওয়া বা নতুন বই-পত্র বেরোলে তা খুঁটিয়ে পড়ে নিজ জ্ঞানকে সমৃদ্ধতর করা ও ছাত্রদের কাছে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করা আর কর্তব্য বলে মনে করেন না। ছাত্ররাও আর অধ্যয়নে ততটা আগ্রহী নয়, 'নোট্স্' জোগাড় করা তাদের অভীষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের যুক্তি-বুদ্ধি সবকিছু জামানত রেখে যেভাবে ভোগবাদী জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন তা দেখেও তাজ্জব বনে যেতে হয়। সমাজসংস্কার দূরে থাক, রাজনীতিকের প্রশস্তি গেয়ে তাঁর দাক্ষিণ্য লাভ এঁদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক কালেও আমরা সত্যজিৎ রায়, নীহাররঞ্জন রায় বা আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো শিল্পী-দার্শনিকদের পেয়েছি—এটা

ঠিক কথা। কিন্তু সামগ্রিক পরিমণ্ডলে তাঁদের প্রভাব কতটুকু ?

এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা। একটা মহানগরী যেখানে রূপ নিয়েছে, সেখানে সাধারণ পৌর ব্যবস্থাদি সচল রাখার ব্যাপারে নাগরিকরা যথেষ্ট আগ্রহী হবেন, প্রশাসকরা যানবাহন, বিদ্যুৎ-সরবরাহ ইত্যাদি চালু রাখায় যত্নবান্ হবেন এসবই কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু একদিকে রয়েছে প্রশাসকদের ব্যর্থতা, অন্যদিকে সাধারণ কলকাতাবাসীর নির্লিপ্ততা। কলেজ স্ট্রীট বা রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর মতো রাজপথকে যেভাবে কুৎসিত দোকানপাট গ্রাস করে নিচ্ছে তা দেখে আমরা নগরজীবন থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি কি না এমন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

আবার, উল্লেখ করা যায় সমকালীন রাজনীতির তামসিকতার কথা। কলকাতার রাজনীতি এখন সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জনের আদর্শবাদী যুগ থেকে বোমা-পিস্তলের যুগে, হামলাবাজি-খুনোখুনির যুগে চলে এসেছে। সমাজ-পরিবর্তন নয়, যে-কোনো ভাবে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা দখল করা কলকাতার রাজনীতিকের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীনীরদ চৌধুরী পৃথিবীর নানা স্থানে একটা 'রিবারবারাইজেশন'-এর লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। আমরা কলকাতাবাসীরা কি সেই 'মহতী বিনষ্টি'-র পথেই দ্রুত এগিয়ে চলেছি ?

সংসার যবে.....

অর্ণব রায়

জগৎসংসারময় শুধু খাই খাই দেখিতেছি। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন সংসারে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিবারণ সম্ভব, দুঃখ নিবারণের উপায় আছে। এহেন দুঃখবৃত্তির পিছনে আমি কেবল একটা নিয়ামককে দেখছি, তা হলো খাই খাই। বঙ্কিমবাবু হাজার রকম বহ্নিতে হাজার রকম পতঙ্গকে দগ্ধাতে দেখেছেন। আমার মধ্যবিত্ত মানসচক্ষু কেবলমাত্র ক্ষুধাবহ্নিতে ক্ষুধার্ত পতঙ্গের দহন দেখেছে। বাব্বা, কি বহ্নি। কোন শালা বলে শ্রীদেবীর রূপের জ্বালা এর থেকে বেশী।

ক্ষিদে নিয়েও রেকর্ড হয়। কেউ বাড়ী খায়, গাড়ী খায়, কাঁচা কাঁচা চিবিয়ে খায়। গ্লাস খায়, মাথা খায়। সাতখানা মার্সিডিজ খেয়ে কেউ রেকর্ড করে। গিনেসবুকে নাম তুলে দিবা দিনেশের মত জ্বলজ্বল করে। কী দরকার ছিল বাপু সাতখানা গাড়ী খাওয়ার। ছটা খেতে আর একটা আমাকে দিয়ে দিতে। তোমারও রেকর্ড হত। আমারও একটু গাড়ী চড়ে সাউথে হাওয়া খাওয়া হত। আমার একটা গাড়ীর ভীষণ দরকার। বউ চাইছে। কি করবো। বউয়ের কথা হলো গিয়ে বেদবাক্য। শুনলে হাতা, না শুনলে আছোলা। রেকর্ডের কথা বলছিলাম না, তা আমারও একটা রেকর্ড আছে। অবশ্য ভাঙা রেকর্ড। আমি ভাঙিনি। পৃথিবীর কোন মনুষ্য ভাঙেনি। মিনি ভেঙেছে। একদিন বাড়ীতে দুধ ছিল না। মাছের দাম পঞ্চাশ টাকা। তাই রাগ করে মিনি ভেঙেছে। আমার গিন্নির আদরের হুলোটা। আমি অবশ্য ওকে বেশ সমীহ করি। বাড়ীর ইঁদুরেরা করে না। তা, বিড়াল বলে কি প্রেস্টিজ নেই। তাই আমিই করি।

কোণ দিয়ে রেকর্ডটা একটু ভেঙে গেছে। তবু দিব্যি চলে। বন বন করে ঘোরে, ক্যান ক্যান করে শব্দ হয়। সকাল সন্ধ্যে সবসময়ই ওই রেকর্ডটাই চলছে।

"সংসার যবে মন কেড়ে লয়।"

পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

না পাঠক, আমি পথ কোনকালেই খুঁজিয়া পাই নাই। লোকমুখে শুনিয়াছি পথ বলিয়া একটা কনসেপ্ট আছে। তাই খুঁজিতেছি। হারাই নাই। তোমার হাতের ক্যান্ডেলটা একটু তুলিয়া ধরো। দেখি, কোন পথে এই গোলোক-ধাঁধায়, না, মানে, গোলোকধামে প্রবেশ করিলাম।

ক্যান্ডেল নিভিয়া গেল। পাঠক আমার, শ্রোতা আমার বোগাস বলে চলে গেল। ইদানীং অবশ্য বোগাস কথাটা বিশেষ চলে না। তার বদলে 'শীট্' কথাটা বেশ শোনা যায়। 'শীট্' কথাটার সাথে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। ছোটবেলায় বাবরের বাবার নাম জিজ্ঞাসা করে তারকবাবু আমার বাবার নাম ভুলিয়ে দিলে দুটো মিছরির মত গাঁট্টা খেয়ে বেঞ্চে দাঁড়াতাম। আধঘণ্টা খানেক পর ঐ শব্দটির শেষে 'ডাউন' লাগিয়ে আমাকে নিস্তার দিতেন আর আমার গিন্নি বর্তমানে শব্দটির আগে 'বুল' যুক্ত করে আমায় সম্বোধন করেন—বুলশীট্। আমার হার্ট-বীট বৃদ্ধি পায়। এত শব্দ হয় যে মনে হয় একটা সাইলেন্সার লাগাই বুকে।

তা গিন্নির রিসেন্ট শখ গাড়ী। কথা নেই, বার্তা নেই গাড়ী। দত্তবাবুর ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। আমাদের কেন কালার নয়। নেবারস এনভি, ওনারস প্রাইড! উকুন তাড়ায়, খুশকি মারে। সব চুল সংসার চিন্তায় উঠে গেছে। টাক মাথায় আমার উকুন বা খুশকীর সম্ভাবনা নেই। কালার টিভি. কিনতে তা একটু খরচ হলো বটে, কিন্তু

শ্যাম্পুর খরচটা তো বাঁচলো।

মাসখানেকের মধ্যে অধীর সেন কালার কিনলেন। আমার বাড়ীর রেকর্ডটা একটু ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলো। 'বার বার উঠে টিভি. অফ-অন করাটা বেশ বোর, একটা রিমোট আনো না, কত আর দাম, মাত্র হাজারখানেক। রিমোট কন্ট্রোল আসার পর মেদের স্তর, মাত্র একধাপ বাড়লো। কিন্তু কি সুন্দর খট্‌খট্ করে সোফায় হেলান দিয়েই টিভি. চালানো যায়, বন্ধ করা যায়। একবিংশ শতাব্দী আসছে। একেবারে নেচে নেচে আসছে। আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে একেবারে তান্ডব নৃত্য শুরু করেছে।

তা ঘোষবাবুরও রিমোট এল, সুতরাং আমার বাড়ীতে কেন ভিসিপি নেই। ভিসিপি এল। অঞ্জন দাসও ভিসিপি কিনেছে। সুতরাং আমার চাই ভি সি আর। ওদিকে নিরঞ্জন কিনেছে মিক্সার। আমার বাড়ীতে কেন ওয়াশিং মেশিন থাকবে না। ইদানিং আবার খুব গাড়ীর শখ। একটা গাড়ী থাকবে। ছোট্ট লাল ছারপোকার মত একটা মারুতি। আমি জড়োসড়ো হয়ে সামনে বসবো স্টিয়ারিং হাতে। পিছনে হুলো কোলে গিন্নি। আইসক্রিমের দোকানে দাঁড়িয়ে বলবে—ড্রাইভার দুটো পেস্তাবার। আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসবো। একটা গিন্নি খাবেন, একটা হুলো। আমি আয়নায় দেখবো আর জিভ চাটবো। পিছনে থেকে তিনি বলবেন—বুঝলে, তোমার প্রেসারটা গোলমাল করছে। বাইরে একদম কিছু উল্টো-পাল্টা খাবে না।

কবি বলেছে ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। আমি বলি ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বাঁশন্ত। এই বাঁশময় পৃথিবীর কতটুকু জানি। বয়স আমার মাত্র চল্লিশ। আমেরিকায় লাইফ বিগিনস্ অ্যাট ফর্টি। আর আমার এখন রোজ বাজার গেলেই মনে হয় পটল কেনার থেকে এইবার পটল তোলা অনেক ভাল। সব কিছুই ফর্ম থাকতে থাকতে ছেড়ে দিতে হয়। সানিকে দেখলে না, ফর্ম যখন চলে গেল। সবাই বলে রিটায়ার করো রিটায়ার করো, করলো না, ফর্ম ফিরলো তারপর ছাড়লো। শাস্ত্রীটাকে দেখ। দিব্যি বাবা প্লেবয় প্লেবয় ইমেজ ছিল। কেন শুধু শুধু অমৃতার সাথে ইয়ে-টিয়ে করতে গেলি। শখের খেলাটা গেল, মেয়ের মেলাটা গেল। সিলেন্টলি গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট খুলেছে। ভারতীয় নারীজাতি, প্রগতিশীল নারীজাতির সাধের লাউ নিজেই এখন বৈরাগী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবে সমস্যা হল কি, আমার বদভ্যাস একবার ব্যাট ধরলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। কতবার আউট হতে হতে হইনি। কিংবা আম্পায়ার খেলা থামিয়ে দিয়েছে। নো-বল ডেকেছে তবু খেলতে ইচ্ছে করে। রিটায়ার করার কথা ভাবতেই ইচ্ছে করে না। আমি তো আর ভীষ্ম নই যে যখন ইচ্ছে হবে কপাৎ করে মরে যাব। বিষে বিশ্বাস নেই। ওসব খেলে নির্ঘাত আয়ু বাড়ে। গলায় দড়ি দিতে গিয়ে একবার দড়ি ছিঁড়ে এমন আছাড় খেয়েছিলাম যে সেকথা সাত জন্মেও ভুলবো না। দড়ির দাম ছ' টাকা জলে গেল। নতুন 'আই অ্যাম এ খৈতানের' ব্লেড গেল বেঁকে। আর কনুই টনুই ছড়ে গিয়ে সেকি কান্ড। চাদরের তলায় আয়োডেক্স ডলি তবু ব্যাথা যায় না কিছুতে।

ভীষ্মকে বহুত হিংসে হয়। শালা তুমি বিয়েই করোনি, ঐ ইচ্ছামৃত্যু দিয়ে তোমার কি হবে। যার যা দরকার তাকে সেটা বিধাতা কিছুতেই দিল না।

মাঝে মাঝে জরাময়, ব্যাধিময়, মৃত্যুময় এই বিশ্বজগৎ দেখে প্রাণে একটা বিষাদ রোমান্টিক পুলক জাগে, সব-কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সিদ্ধার্থ হতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম যে সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ধরো তুমি তপস্যা-টপস্যা করলে, ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে পায়েস হাতে সুজাতার জন্য অপেক্ষা করছো। এমন সময় খবর পেলে সুজাতা আজ আসতে পারবে না। কাল 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া' দেখে খুব টায়ার্ড। তোমার উপবাস ভঙ্গ হবে না। তার থেকে যা চলছে তাই ভালো। রোজ ওঠো, দাঁত মাজো, টয়লেট করো, দাড়ি কাটো, অফিসে গিয়ে ঘুমোও। বসের আসার বা উপরি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকলে নস্যি নিয়ে যাও। নাকে দাও, ঘুম কেটে যাবে।

"আসুন আসুন, গরীবের অফিসে একটু পায়ের ধুলো দিন। একটু হাতের ময়লা দিন। আপনাদের জন্যই তো বেঁচে আছি।"

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে একটু মেরুদন্ড মটমট্ করতে পারে। এখনও অল্প-বিস্তর টিঁকে আছে। পুরোপুরি

তবুনাস্তি হয়ে যায়নি। ডাক্তারের কাছে গেলাম। কোন লাভ হলো না। পুরোনো আদর্শের কাসুন্দিটা প্রথম পাতে খাওয়ার অভ্যাস। খুব বেশী বিবেকের বদহজম হলে রাত্রে খেতে বসে একটু খাই। কিন্তু বোতলের গায়ে লেখা 'খাইবার আগে ঝাঁকাইয়া লইবেন।' কিন্তু ঝাঁকাতে গেলে ঝাঁঝটা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু রাত্রে অন্ততঃ একবার দেশোদ্ধার ব্রত না করলে ভাত হজম হয় না। আমার তো দেশনেতা হওয়ার সব সম্ভাবনাই ছিল। ঘটনাচক্রে হওয়া হয়নি। তাই খেতে বসে আদর্শের কাসুন্দি দিয়ে ভাত গিলতে ভালোই লাগে। আমরা বাঙালী। স্বপনে জাগরণে দেশোদ্ধারই আমাদের ব্রত। নিজের আখের গোছাতে সমস্যা না থাকলে, নিজের আঁতে ঘা না লাগলে দেশোদ্ধারে ক্ষতি কি? আরে বাবা, চায়ের দোকানে বসে, খাওয়ার টেবিলে বসে, ভীড় বাসে ট্রামে চলতে চলতে দেশোদ্ধার করতে তো আর কিছু শক্তিক্ষয় হয় না। কিছু শব্দব্যয় হয় মাত্র। আর আমরা বাঙালী। আর সব কিছু ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা যত কৃপণই হই না কেন ঐ শব্দের বেলায় আমরা হিসেব করে খরচ করি এমন কথা ঘোর নিন্দুকেও বলবে না।

সরকার আসে যায়, সরকার আসে যায়। টিভি-তে স্টার বদলায়, অ্যাড বদলায় না। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা থেকে কেন্দ্রের চক্রান্ত হয়ে বন্ধু সরকারের লাভটা কি হল, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম। চক্রপদ্ম হাতুড়ী হস্ত। ফুলকো লুচির এপিঠ-ওপিঠ। এদিকে টোনা মারলাম ফস্ করে ভাপ বেড়িয়ে হাত পুড়লো। মুখে আঙুল দিয়ে চুষতে চুষতে ভাবছি ঐদিকটায় টোনা মারলেই বোধহয় ভাল হতো। পরের লুচিটা নিয়ে ওদিকটায় টোনা মারলাম। একই অবস্থা। থার্ড লুচিটার কোনটা কোনদিকে বুঝতেই পারলাম না।

তা আমার গিন্নি লুচিটা ভালোই ভাজেন। যবতক দুনিয়ামে রেপসিড রহেগা তব তক্ বাঙালী কা ভোজন রহেগা। আমার মেয়ে রেপসিড ও লুচি দুটোই ভীষণ ভালবাসে। চোদ্দ বছর বয়স। মায়ের কাছে প্রগতিশীলতার শিক্ষা পায় আর ডেক্ চালিয়ে হল্লা করে। বাইরের লোকের সামনে দুরকম ঠাটই বজায় থাকে। এ ব্যাপারে আমার গিন্নি করিৎ-কর্মা।

যদি মিস্টার ডাট্ আসেন তখন খাটের তলা থেকে হারমোনিয়ামটা বার হয়। কারণ মাইকেল জ্যাকসন, বনি-এম দিয়ে মিসেস ডাট্ ও তাঁর কন্যাকে টেক্কা দেওয়া যাবে না সেটা তিনি ভালো মতই বোঝেন। মিসেস ডাট্ও মেয়ের গান শুনে মাথা নাড়েন বোদ্ধার মত।

—"আপনার মেয়ের সম্ভাবনা আছে দিদি, বেশ গলা। জোরও আছে। চড়ায় গলার কাজও নিখুঁত।" সে কথা আমি বিলক্ষণ জানি, গলার জোর না থেকে যায় কোথায়, কোন মায়ের মেয়ে দেখতে হবে না। তা আমার গিন্নি বলেন—আসলে দেখুন না, একদম রেওয়াজ করে না। তাছাড়া গলায় একটা না একটা ট্রাবল লেগেই আছে। তার উপর পড়াশোনার চাপ।

—হ্যাঁ, ঐ জন্য আমিও আমার মেয়েটাকে কিছু বলতে পারি না। স্প্যানিশ শিখছে। ভালোই বাজায়। কিন্তু ঐ একদম রেওয়াজ করে না।

—আমিও ভেবেছিলাম মেয়েকে কিছু বাজনা শেখাবো। কিন্তু ওর বাবা ক্ল্যাসিকাল খুব পছন্দ করেন। তাই……।

—না দিদি এভাবে কোন ডিসিশন নেওয়া ঠিক নয়। আফটার অল এটা উইমেনস লিব-এর যুগ। এযুগে এভাবে পুরুষ দ্বারা কথায় কথায় প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয়।

—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কী জানেন, ঘরটাও তো সামলাতে হয়। আমার উনি খুব রগচটা। ওনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে হয়তো বাজনা-টাজনা আছড়ে ভেঙেই ফেলবেন।

—সেকি এতো রীতিমত আপনাদের এক্সপ্লয়েট করা। আমি হলে বাপু মুখ বুজে সহ্য করতুম না। এই তো আপনাদের মিস্টার ডাট্ যেদিন…।

প্রসঙ্গ পতিনিন্দায় চলে গেলে আর কী চাই।

"আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা, দোষ কারো নয় গো মা।" পতিনিন্দা ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য। ট্র্যাডিশন মানুষকে অভিজাত করে, আর প্রগতিশীলতা মানুষকে অ্যারিস্টোক্রাটিক করে। আর দুইয়ে মিলে যে

জগাখিচুরীটা পাকায় তা ভারতীয় নারী জাতিকে উজ্জ্বল করে। 'খারিজ' দেখে সো স্যাড, সো স্যাড, আর কাজের মেয়ে একদিন না এলে মাইনে কাটার কৌশল খোঁজা। টি ভি-তে ভি সি আর-এ আর্ট ফিল্ম দেখেন। পরের দিন মেয়েকে স্কুলে পেঁাছে দিতে গিয়ে স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্রিটিকাল অ্যাপ্রিসিয়েশন চলে। আর লোডশেডিং হলে, খরা হলে, বন্যা হলে, গরম পড়লে, শীত বাড়লে সিস্টেমের নিন্দে করেন। রাজনীতি নিয়ে কথা না বললে নারীজন্ম সার্থক হবে না। সিস্টেম শব্দটা দিনে একবার অন্তত উচ্চারণ করা চাই। আর বাড়ীতে কেউ বন্যাত্রাণের চাঁদা চাইতে এলে একরাশ বিরক্তি মুখে বলেন—দিন-কয়েক পরে আসুন না ভাই।

আমার গিন্নিকে দেখি মিসেস্ ডাট এলে হারমোনিয়াম বার করেন খাটের তলা থেকে। আর আমাদের পাড়ার স্কুলমাস্টার ঘোষালবাবুর বউ এলে ঘরে হারমোনিয়াম আছে বোঝাই যাবে না। আমার মেয়ের গানের গলাটা যে কেমন তা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি যদি আমার বাড়ীর কর্পোরেশনের মেয়র হতাম তাহলে সাউণ্ড পলিউশনের নোটিশ দিতাম। কিন্তু আমি আমার বাড়ীর জমিদার হওয়ার জায়গায় নেহাতই জমাদার হয়ে গেছি। আমার কথা যে কিছু না সেটা আমার মেয়ে থেকে আরম্ভ করে হুলোটা পর্যন্ত বোঝে। তাই মেয়ের গলা সাধার নাম করে সকাল সন্ধ্যে পরিত্রাহি চিল্লানিতে জগৎসংসার টলমল করার পর আমার সুস্থ থাকার সম্ভাবনা যেটুকু টিকে থাকে ঘোষালবৌদি বা অবিনাশদার বৌ এলে টেপডেকে রকমিউজিক চালিয়ে সে সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়।

ঘোষালবৌদি বা অবিনাশদার বৌ যে সত্যিই গানের সমঝদার এটা আমার গিন্নি বোঝেন। তাই তাদের সামনে স্ট্যাটাসের ধমক। পপ-রক-ডিসকো। বসার ঘরে উদ্দাম সুরে চলতে থাকে—আই অ্যাম এ ব্রেকডান্সার। আর আমি ভেতরের ঘরে বসে গুনগুন করি—বল মা শ্যামা দাঁড়াই কোথায়।

ঘোষালবাবুর মাসমাইনে দু' হাজার টাকাও নয়। দুদিন ঐ গান শুনলে আর আসবে না। আমার গিন্নির বুদ্ধিটা জোরালো। হবে না বিউটি পার্লারে মাসান্তে একবার ঐ মাথাটা শার্প থেকে শার্পার হতে যায়। মহিলাদের পত্রিকায় বিভিন্ন ফিচারে বাঙালী নারীকে মহীয়সী, বিদুষী করার যে মন্ত্রগুলি নিহিত সেগুলি নিয়মিত গেলেন। খবরের কাগজ পড়া ধাতে সয় না। টিভি.-তে সিরিয়ালের ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজী হিন্দী খবরটা কানে যতটুকু ঢোকে তা ভাঙিয়ে দিব্যি চলে যায়। দেশ তার কাছে একটা দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপ মাত্র। ছোটবেলায় স্কুলে দেখেছে। সেটা খায়, না মাথায় দেয়, জানে না। জানার আগ্রহ আছে অবশ্য। তা ফাল্গুনী, আশুতোষ, নিমাই, প্রফুল্ল পড়ে দিব্যি জানা যায়। এদের বাইরে বাংলায় আবার সাহিত্যিক আছে নাকি। এহেন আমার সবজান্তা গিন্নি টাইমের প্রসঙ্গে নিজেকে ঠিকঠাক তাল মিলিয়ে এগিয়ে যান। যথার্থই আধুনিকা।

তা বছরে বছরে নতুন ফ্যাশানের শাড়ী পরার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠাকুরের ব্রত করার রেওয়াজ মা মেয়ের দুজনেরই। সন্তোষী মাতে পেয়েছিল মাঝে। রিসেণ্টলি আবার ইঁট পুজো, ইঁট পুজো করে লাফালাফি। গিন্নির আমার যা ভয় তা ওই পুলিশে। অনেক কষ্টে বোঝালাম টোঝালাম যে ওসব পুজো ডিসপিউটেড্ ব্যাপার। পুলিশে ধরবে। তা সে যাত্রায় ক্ষান্ত করা গেছে। আমার সমাজ সচেতনা স্ত্রী, রাজনীতির মাথামুণ্ডু বুঝুক না বুঝুক, তর্ক না করলে ঠিক আধুনিকা হওয়া যায় না, তাই এঁড়ে তর্কে ওস্তাদ তিনি। যুক্তি, বুদ্ধির মাথামুণ্ডু নাই। তাই আমাকে ওয়াকওভার দিতে হয়। পুরনো রেকর্ডটা বাজছে শুনতে পাই—সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ।

তবু টিকে আছি। টিকে থাকতে হয়। ডারউইনের থিওরি শ্রেষ্ঠতমের উদবর্তন। যে যত মানিয়ে নিতে পারে তার টিকে থাকার অধিকার তত বেশী। রোজ উঠি, খাই-দাই, অফিস যাই। বাসে উঠে গুঁতিয়ে গাঁতিয়ে লেডিস্ সীটের সামনে চলে যাই। নারী প্রগতি যত বাড়ছে, ব্লাউজের মাপ তত ছোট হচ্ছে। ফ্যাশান চেতনা যত বাড়ছে শাড়ীর ট্রানস্পেরেণ্ট ভাব তত বাড়ছে। তবু আমার সচ্চরিত্র সুনামটা গেল না। না বাসে না অফিসে। ভয়, একটা নিদারুণ ভয় থেকে গেল বলেই আমি এত সচ্চরিত্র। বাসে উঠে হাতাশ্রী, কনুইশ্রী চালানোর সাহস হলো না। সচ্চরিত্র থেকে গেলাম। লোভে জিভ টস্ টস্ করে। তবু কাঁধের কাছ থেকে নার্ভগুলো ভয়ে কাজ করে না। অফিসেও তাই। আমার গিন্নি বাসের খবর রাখেন না; অনুমান করেন, প্রশ্ন করেন না। কিন্তু অফিসে যে আমার

শুধু শুধুই রাগ করেন। আরে বাবা উপরির লোভ কী আমার কম আছে। কিন্তু যত লোভ হয়, তত সাহস হয় না। তোমার পতাকা যাকে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি। তা পতাকার জন্য ডাণ্ডা লাগে। আমার অফিসে সকলের হাতে ডাণ্ডা আছে; পতাকা নেই। আমার পতাকা আছে ডাণ্ডা নেই। কি করে কি হবে। সচ্চরিত্র নিষ্ঠাবান বলে একটা প্রাচীন ট্র্যাশ অপবাদ নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই।

তবু মাসান্তে শ'পাঁচেক টাকা হাত ঘুরিয়ে আসে। ছুঁচোও মরে না, তবু হাত গন্ধ হয়। কিন্তু যা পাই তাই লাভ। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। যাহা পাই তাহা টুক করে পাই, যাহা পাই তাহা ছাড়ি না।

রাত্রিবেলা শুলে পড়ে আবার মেরুদণ্ড মটমট করে। পেট ফাঁপায়। বুঝি আদর্শের কাসুন্দিটা বেশী খেয়ে বদহজম হয়েছে। বউ এসে পরনিন্দার আয়োডেক্স ডলে দেয়। দিব্যি কাজ হয় ক্ষুধাময় পৃথিবীটা জলজল করে। হে পেট তুমি দীর্ঘজীবী হও। সব কিছু ভুলিয়ে দাও। দুঃখ ভুলিয়ে দাও, শিক্ষা ভুলিয়ে দাও, জগৎ মায়া, পৃথিবী মায়া, নাম মায়া, শুধু ক্ষিদে সত্য, অর্থ সত্য। জিন্দেগী একসফর। কাল কী হবে কিছু জানি না। শুধু জানি চলছে চলবে। ক্ষিদেটা যখন রয়েছে, অর্থের ক্ষিদে আর পেটের ক্ষিদে তখন চলছে চলবে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ। কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা। কিচ্ছু দেখতে পাই না। ছুটে বেড়াই। যেদিকে পারো, ছুটে বেড়াও। হাতদুটো দুদিকে ছড়ানো, অন্ধকারের মধ্যে ছুটছি। সেই ফাটা রেকর্ডটা সমানে ক্যানক্যান করে কানের গোড়ায় বেজে চলেছে—
সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ।

'পৃথিবীর সমস্ত লোক অন্ধ হয়ে যাক'

অমরনাথ দে-র সঙ্গে অদ্রীশ বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার

[একসঙ্গে দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে নেমে গেল বারান্দার ওপর। ডানদিক ঘুরে অন্তত কুড়ি পা হাঁটলে সোজা ডানহাতে পরে বড় দরজা। সেটা দিয়ে ঢুকে লাইব্রেরীর বই জমা দেওয়া। ফেরত এসে, আবার তিনতলায় উঠে পরের ক্লাশটায় ঢোকার আগে বাঁহাতের কলটায় জলপান। পেছন ফিরে ডান দিক বাঁদিক ঘুরে আবার ডান হাতে দ্বিতীয় ঘরটায় সোজা হেঁটে চতুর্থ চেয়ারটায় বসে অমরনাথ। কাউকে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই এতটা বা তারচেয়েও কঠিন কাজগুলো করে প্রতিদিন। অমরনাথ দে দৃষ্টিহীন। জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন। অথচ পিকাসো আমাদের জন্য ভেবেছিলেন, মানুষ যা দেখে তার চেয়েও মানুষ বেশি দেখতে পাক। তাঁর আঁকা চরিত্রদের একজনকে তাই ছ'জোড়া চোখ দিয়েছিলেন পিকাসো। অমরনাথের একজোড়া চোখও নেই। তবু অমরনাথের একটা জগৎ আছে। কি সেই জগৎটা? আমাদের দৃষ্টির জগৎ আর অমরনাথের দৃষ্টিহীন জগৎকে কেন্দ্র করেই এই সাক্ষাৎকার। অন্ধকারে কি কোনো ছবি থাকে? শুধু শব্দ আর গন্ধ কি ফুটিয়ে তুলতে পারে কোনো সম্পূর্ণ ধারণা? আমাদের ভাষা, আমাদের কবিতা, আমাদের প্রকৃতি, আমাদের নারী, যৌনতা—এসব অমরনাথের মধ্যে কি কোনো ভিন্ন ধারণা নিয়ে আছে? কথা হয়েছে খুবই খোলামেলা ভাবে এই সমস্ত নিয়ে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক হিসাবে যে সমস্ত ব্যক্তিগত জগৎকে আমরা ছুঁয়ে যাই, কথা হয়েছে বিনাদ্বিধায় সে সব নিয়ে। হুবহু রইল সেসব। এমন কি সাহস, বেপরোয়া আর ঝুঁকি নিয়ে। এই সাক্ষাৎকার যখন গ্রহণ করা হয় তখন অমরনাথ প্রেমে পড়েছে একটি কিশোরীর। আমাদের কলেজেরই ছাত্রী সে। এবং এই সাক্ষাৎকার দেবার পরই অমরনাথ তাকে প্রস্তাব করবে বলে মানসিকভাবে প্রস্তুত। সময় ঘণ্টা চার এই কথাবার্তা চলেছে। বিকালে চারটে কুড়িতে ক্লাশ শেষ করেই চলে আসবে নির্দিষ্ট ঘরে মেয়েটি। সে সময়ের চিন্তায় যত টেনশন অমরনাথের। আমার সঙ্গে কথা ছিল মেয়েটি এসে গেলেই উঠে আসতে হবে। সেই মতই কথা শুরু হল। যতটা সম্ভব প্রাথমিক পরিচয় থেকেই। একদম আলো-ছায়া ধরে।—অদ্রীশ বিশ্বাস]

* অমরনাথ, তুই কি আলো ছায়া বুঝতে পারিস?

—হ্যাঁ, আলো-ছায়াটাই শুধু বুঝতে পারি। সেটা ছাড়াও সামান্য সামান্য ভাবে আর একটা ব্যাপার বুঝি। সেটা হল রঙ। রঙ আগে ভাল বুঝতে পারতাম। যখন ছোট ছিলাম, তখন আলোয় রাখা রঙ চিনে নিতাম মোটামুটি। এখন অত ভাল করে পারি না। ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে চোখটা। তবু বুঝতে পারি, কিন্তু এক সঙ্গে অনেক রঙ থাকলে চিনতে অসুবিধা হয়। হয়তো পারব না।

* ছোটবেলায় রঙ চিনলি কি করে?

—মা বলতেন, এটা লাল পুতুল কিম্বা নীল বল। তা, যে রঙের প্রতিফলন পেতাম চোখে সেখান থেকেই চিনেছি রঙটা।

* আর, বস্তুর ধারণা তোর কি রকম? এই যেমন ধর, বাড়ি-ঘর, গাড়ি, চেয়ার-টেবিল····

—স্পর্শের মাধ্যমে। শব্দের মাধ্যমে। আর অনেকটাই স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ দিয়ে একটা কল্পনার জগৎ থেকে তৈরী হয় এইসব ধারণাগুলো। যেমন, আওয়াজ শুনে গাড়ি যাচ্ছে বুঝতে পারি। কিম্বা গাড়ির ছায়াটা অস্পষ্ট ভাবে চলে গেল, বুঝলাম গাড়ি। কিন্তু গাড়িটা কেমন, কি তার বৈশিষ্ট্য আকারের মধ্যে, তা বুঝি না। সবটাই দৃশ্যের বাইরে। দৃশ্যমান জগতের কোনো ধারনা আমার তোমাদের মত করে নেই।

* যেমন ধর আমাদের দৃশ্যের ধারণার একটা পার্সপেক্টিভ আছে। একটা বস্তু আর একটা বস্তু থেকে অতটা দূর কি কাছে। এভাবে আমরা বস্তুর একটা সমান্তরাল ধারণা পাই। আমরা দৃশ্যমান জগতের বস্তুকে ব্যালেন্সড করে দেখি। সব একটা ধারণ ক্ষমতার মধ্যে থেকে।

—আমার এটা নেই। আমি দূরত্ব বুঝি গন্ধ দিয়ে। একটা কিছুর গন্ধ আমাকে সে বস্তু থেকে দূরত্ব এবং তার একটা ধারণা তৈরী করে দেয়।

* যার গন্ধ নেই সে বস্তু ?

—কোন দূরত্বে থাকলেও, ধারণার মধ্যে থাকে না।

* আমার কিন্তু তবু এটা আগ্রহ হচ্ছে জানতে যে, গত দু'বছর আগে, তুই যখন আমাদের সঙ্গে পাল্লার রোডে গিয়েছিলি, তখন তুই বলে ছিলি, 'অদ্রীশদা জায়গাটা সুন্দর'। এটা কি করে বুঝলি ? আমরা তো কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সুন্দর বলি একটা পার্সপেকটিভ থেকে দেখে। ধর, তুই একটা গাছকে ধরে বুঝতে পারলি, তার মসৃণভাবটা কিম্বা উচ্চতার একটা ধারণা করলি স্পর্শ করে। কিন্তু যখন দশটা গাছ একটা বিশেষ কম্পোজিশনে থাকে, তার মধ্যে দিয়ে মাটির পায়ে চলা পথ এঁকে বেঁকে যায়, পাশে নদী থাকে, ফুলগাছ, দু-তিনটে চড়াই উৎরাই মিলে একটা তরঙ্গময় ভূমি তৈরী করে। এসব একটা জ্যামেতিক পদ্ধতিতে থাকে এবং তা দেখে সবটা নিয়েই আমরা বলি সুন্দর। তুই এটা কিভাবে বুঝিস ?

—পাল্লারবোড, আমি সেখানে একটা নতুন গন্ধ পেলাম। সুন্দর গন্ধ। সুন্দর হাওয়া। যখন হেঁটে যাচ্ছি তখন শব্দে বুঝছি পাশে কেউ স্নান করছে পুকুরে, পশু পাখি ডাকছে। এসবটাই একটা অন্যরকম আনন্দ দিল আমাকে। গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ধারণা। দৃশ্যের ধারণায় তাই ওগুলোই আমাকে ইঙ্গিত করে দৃশ্যটা। প্রকৃতির ধারণা বলতে কিছু নেই তার বাইরে। যেমন ধর আকাশ নীল, বুঝতে পারি সামান্য রঙের ধারণা থেকে। কিন্তু তাতে মেঘ ভেসে যাচ্ছে তা বুঝতে পারি না। শুনতাম সেটা। আগে ভাবতাম মেঘটা বুঝি চামড়ার মত। এখন ভাবি গোলাকার, কালো, খুব ঠাণ্ডা একটা কিছু।

* আর সবটা মিলে যে দৃশ্যটা আমাদের ···

—সেটা আমার ধারণায়। তোমার তো দর্শন ছিল। সেই যে আমরা পড়ছি না, সরল ধারণা, জটিল ধারণা—তা সরল ধারণা মনের সৃষ্টি। আমার তো একটা বেসিক স্ট্রাকচার আছে। যেহেতু আমি মেঝে, একটা অবস্থানে আছি। ফলে এই ভূমির ধারণা, স্পর্শটা যেখানে প্রধান, সেখান থেকেই আমি যে বেসিক স্ট্রাকচারটা গঠন করেছি তার সঙ্গে হয়তো বাইরের লোকেদের অমিল আছে। অনেকটাই কাল্পনিক। ইচ্ছার জগৎ যেমন হয় মানুষের তেমন। জ্যামেতিক যে ব্যাপার, আমার বোধবুদ্ধি আমাকে জ্যামেতির জ্ঞান দিয়েছে। ফলে এখন আমার মধ্যে জ্যামেতির ব্যাপারটাও আছে, কিন্তু কাল্পনিক ভাবেই। আমার যে ক্যামেরা, তা সে মানুষমাত্রেরই থাকে। সেটাও কাল্পনিক। সেই ক্যামেরায় আমার কাল্পনিক জ্যামেতিক ধারণা স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ দিয়ে সাজিয়ে নেয় একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যকে, আমি তাই ধারণা করি জায়গাটা সুন্দর অথবা খারাপ। এটা তোমাদের সঙ্গে নাও মিলতে পারে।

* অমরনাথ আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, তুই স্বপ্ন দেখিস কিনা ? যেহেতু তুই দৃশ্যমান জগৎ দেখিসনি, সেহেতু আমরা যেমন স্বপ্নে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলি, হাঁটি-চলি, গাছপালা, পাহাড়, নদী দেখি তেমনি তোর স্বপ্ন কিভাবে তৈরী হয় ?

—আমি মনে করি না যে, যারা চোখে দেখে তারাই শুধু স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন চোখে দেখার জিনিস নয় শুধু, তুমি চেষ্টা করে দেখো। তাই, আমিও সবার মত স্বপ্ন দেখি। আমরা কল্পনা করি বলে কাল্পনিক ভাবেই স্বপ্নটা দেখি। এটার প্রসঙ্গে পরে আসছি, তার আগে বলি, আমি যে স্বপ্নগুলো দেখি সেগুলো আমার জাগ্রত অবস্থার জগতের মতই। আমি স্বপ্নে মানুষ বা ঘরবাড়ি অর্থাৎ দৃশ্য কিছু দেখি না। আমার স্বপ্নে থাকে শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। দু' বন্ধু কথা বলছে, সেটা পরিচিত কণ্ঠস্বর আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে যেভাবে জাগ্রত অবস্থায় বুঝতে পারি, সেভাবেই দৃশ্য না দেখে স্বপ্নেও বুঝতে পারি। কিন্তু ঐ, দূরত্বের ধারণাটা সবমিলে এখানেও আমি করতে পারি না। স্বপ্নেও তাই আকস্মিক ঘটনা ঘটে। চলতে চলতে হঠাৎ দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম। তার আগে জানতাম না এখানে দেওয়াল। হয়তো কোনো শব্দ দিয়ে কিছুর ক্লু পেলাম। না পেলে সতর্ক হতে পারলাম না। আবার ধর, একদিন দেখলাম চলতে চলতে হঠাৎ একটা উঁচু জায়গা থেকে পা ফসকে গেল। তারপরই নদীতে পড়ে গেলাম। সে এক ভয়ঙ্কর নদী। অনেক জল। ডুবছি তো ডুবছিই জলের তলায় চলেই যাচ্ছি ক্রমশ। আকুল ভয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল।

* আর যে বস্তু দেখিস নি, ধারনা নেই বাস্তবের, সে রকম স্বপ্ন ?

—হ্যাঁ দেখি। আমি বাস্তবে সমুদ্র দেখিনি। স্বপ্নে পেয়েছি সমুদ্র। সেটা জলের আওয়াজ। জলটা গরম, অনেক জল, ভারী মতন একটা জলের ধারণা। তবে আমার সমুদ্র শান্ত। জলটা কখনো নোনা, আবার কখনো নোনা নয়। খাচ্ছি জলটা, মিষ্টি। আবার ধর স্বপ্ন দেখি কাল্পনিক বিষয়ে একদম। যেটা বলছিলাম, উড়ে যাচ্ছি। আকাশে উড়েছি। কিম্বা গন্ধ পেলাম। যে গন্ধ আগে কখনো শুঁকিনি। পরে ইচ্ছে করে সে গন্ধ পেতে। আমি তখন জানিই না কি সেই গন্ধ। হয়তো শেষে কোনো একটা শোনা জিনিসের মধ্যে থেকেই সে গন্ধ পেয়ে গেলাম। তখন বেশ ভাল লাগলো।

* তুই নিশ্চয় দেশ ভালবাসিস। আমিও আমার দেশকে ভালবাসি। এই দেশাত্মবোধ বা স্বদেশ চেতনা আমাদের জন্মেছে দেশকে দেখে। যখন 'শস্য শ্যামলা সোনার বাংলা' বলি তখন কিন্তু আমার দেখা শস্যপূর্ণ সবুজ ক্ষেত, বাংলার বাড়ি ঘর, নর-নারীর চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে। এই চিত্রর সঙ্গে ফ্রান্স কিম্বা বিদেশের গ্রাম্যচিত্রর তফাৎ আছে। এই তফাৎটা মূলত দেখেই নির্ধারণ করি। আমরা তাই বলতে পারি আমাদের দেশ আর ওদের দেশের কথা। কতটা পার্থক্য। গ্রাম হয়তো দু'টোই, কিন্তু ঐ দেখার পার্থক্যই আমাদের বোধের মধ্যে ভিন্ন রিঅ্যাকশন তৈরী করে। তোর ক্ষেত্রে কিভাবে হল এই স্বদেশচেতনাটা ?

—দেখার সঙ্গে সঙ্গে তুমি যেমন আরো কিছু পাও। শব্দ এক্ষেত্রে প্রধান। নানা শব্দ তোমায় সাহায্য করে। আমার এটাই এক্ষেত্রে প্রধান। আমি আমার দেশের পাখির ডাক শুনেছি, জন্তু-জানোয়ারের ডাক শুনেছি, এটা আমার ভাল লেগেছে। আমার পরিচিত শব্দ আমাকে সুন্দরের ধারণা দিয়েছে। সঙ্গে কল্পনাও আছে। ফ্রান্সের গ্রাম সম্বন্ধে আমি শুনেছি, সেখানে গাড়িও চলে। আমাদের গরুর গাড়ি। দুটো যানের শব্দের পার্থক্য আছে। আবহাওয়াটা হয়তো অন্যরকম। ফ্রান্সে আমাদের দেশের মত সোঁদা পুকুরের গন্ধ পাব না। শস্যের একটা গন্ধ আছে—এটা আমি আমার দেশেই একমাত্র পাব, তার সঙ্গে আছে ভাষার পার্থক্য। সবচেয়ে বড়। পার্থক্য হবে যথেষ্ট, কিন্তু এক্ষেত্রে কি পার্থক্য হবে এটা কল্পনা করা খুবই কঠিন। ভাষা শুনে আমি হয়তো আমার কল্পনা দিয়ে এক ধরণের মানুষ গড়ে নেব। হয়তো সেটা তোমাদের সঙ্গে মিলবেই না, অন্য রকম কিছু, তবু একটা অনির্বচনীয় ব্যাপার সেটা আমার কাছে, অন্য রকম। আমি যেমন এখনো তাই মানুষ কেমন দেখতে, পূর্ণ অর্থে বুঝি না। আমায় বলে দেবে মানুষ কেমম দেখতে ? আমি কেমন দেখতে ?

কেন ? এটা তো তুই নিজেকে স্পর্শ করে করে বুঝে নিতে পারিস।

—হ্যাঁ পারি, কিন্তু এটা তো তুলনা করে বুঝতে পারছি না। কারণ, আমি অন্য কাউকে সেভাবে স্পর্শ করে দেখিনি। অন্যের মুখ তার মুখের ভাঙচুর গুলো বুঝে নিয়ে আমি তুলনা করতে পারছিনা। আমার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা, তাও খণ্ড ধারণা। আমি তো আমাকে কোনো ফোকাস দূরত্বে দেখতে পাচ্ছি না। কাউকে পাইওনি। ফোকাস দূরত্ব না পেলে সম্পূর্ণ ভাবে বোঝা যায় না। আমার ফোকাস্ দূরত্ব নেই তোমাদের মত। কিন্তু যেটা বলছিলাম, আমারও মনে একটা ক্যামেরা আছে' সেটায় আমি কল্পনায় ধরে নিই মানুষটা কি রকম দেখতে হতে পারে। তবে ভাল বা খারাপ বোধটা এক্ষেত্রে আমার নেই। মানে সুন্দর কি অসুন্দর জানি না। জানাব দরকারও হয়নি। তাই আমার কল্পনার জগতে 'বিউটি পার্লার'ও নেই। এতে বরং বেঁচেই গেছি বলতে পারো। সারা পৃথিবীতেই দেখো না, শুনছি আজও কি রকম বর্ণ বৈষম্য চলেছে। সাদা কালোয় বিভেদ। আমি এই বিভেদ বুঝি না বলেই সারা পৃথিবীর একটা বর্ণহীন মিলন কল্পনা করে নিই। সবাই সবার হাত ধরে হাঁটছে, সেখানে সাদা বা কালো বা শ্যামলা সবাই আছে। চোখ বুজলে সব তো সমান। চোখ মেললেই গণ্ডোগোল। তারচেয়ে এসব বিভেদ কিছুই থাকে না, যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত লোক অন্ধ হয়ে যায়।

* অমরনাথ, মেয়ে সম্বন্ধে তোর ধারণা কি ? আমাদের মেয়ে সম্বন্ধে যে আকর্ষণ, তা প্রথমত বাইরে থেকে দেখে। একটা মেয়ে যে ছেলেদের থেকে শারীরিক ভাবে পৃথক, এই পার্থক্য আমরা দেখে বুঝি। সেটাই আমাদের আকর্ষণের প্রথম রহস্য। বায়লজিক্যাল কারণ সবার ক্ষেত্রেই রইল, তবু যে অনুভূতির এই জগৎটা, বিশেষ করে এই বয়সটায়, এটা তোকে কি ধারণা দেয় ?

—কোনো দিনই আমি নারীসংসর্গ করিনি। নারী বলতে আমার জীবনে মা, যিনি ছোটবেলায় আমাকে মানুষ করেছেন আর তার বাইরে শূণ্য। অর্থাৎ বিস্মৃত সেই মার কাহিনী বাদে আমার জানা নেই মেয়েরা সুক্ষ্ম অর্থে কোন্ কোন্ পার্থক্য বহন করে। শারীরিক গঠনের পার্থক্য আছেই এটা জানি। যেমন হাত ধরলে বুঝতে পারি আমার সঙ্গে তার হাতের কমনীয়তার পার্থক্য। ব্যবহারের পার্থক্য। কথা বলার ঢঙয়ের পার্থক্য। আর সবচেয়ে বড় হল তাদের গলার আওয়াজ। আমার কাছে একটা সুন্দর মেয়ে মানে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। দেখতে ভাল কি খারাপ, এটাতে কিছু এসে যায় না। মেয়েদের সম্বন্ধে আমিও আকর্ষণ বোধ করি কিন্তু সেটা অনেক গভীরতা থেকে। বাহিক ভাবে আমায় যেহেতু শরীর কোন অ্যাপিল রাখে না।

* হয়তো কণ্ঠস্বরটাই তোর জগতের যৌনতার অ্যাপিল।

—হ্যাঁ, একরকম ঠিক কথা।

* যৌনতা সম্বন্ধে তোর কি ধারনা? আমরা তো মূলত দেখেই এই ধারণা তৈরী করি। যারা যৌন সম্পর্ক করেনি বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে এই জগৎটা দেখে-শুনে জানা। দেখা-অভিজ্ঞতার বাইরে তোর জগতে তুই কিভাবে বুঝিস এটা?

—আমার যৌন ধারনা অস্বচ্ছ। যেহেতু কোনো মেয়েকে, অন্তত এই বয়সের, আমি শারীরিক ভাবে জানি না, সেহেতু আমার মধ্যে শরীরকে কেন্দ্র করে যে যৌনতার ধারণা, তা খুব স্পষ্টভাবে নেই। যা আছে তা শুনে, গল্প-উপন্যাস পড়ে। এর সঙ্গে কল্পনা। এটা কল্পনায় যে চিত্রগুলো দেয়, সেটা অনির্বচনীয়।

* অর্থাৎ শরীরটা কোন আকর্ষণ নিয়ে তোর কাছে দাবী রাখে না।

—হ্যাঁ, অন্তত প্রাথমিক ভাবে। এখনো। বয়সের ধর্ম বলে যৌনতাটা আসেই কিন্তু প্রথমেই আমি কোনো মেয়েকে 'সেক্সি' এটা ভাবি না। সেক্সটা আমার কাছে কণ্ঠস্বরে। তাই খুব সহজে কাউকে ভালবাসি না, যাকে ভালবাসি তাকে খুব।

* এক্ষেত্রে, আমার শুনে মনে হচ্ছে, তুই যেহেতু পুরুষ, এবং বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণের রহস্যের শারীরিক দিকগুলো অনুপস্থিত বলে তুই পুরুষের প্রতিই আকর্ষিত হয়ে উঠবি। যেহেতু হাতের কাছে নিজেকেই বা নিজের পুরুষ শরীর-টাকেই পাচ্ছিস। অপর পক্ষে অন্ধ মেয়েদেরও তাই হওয়া উচিত। আমি তোর কাছে এটা হয় কিনা জানতে চাই।

—না, অদ্রীশদা। সমকামীতা আমার নেই। তোমার কথা কিছুটা ঠিক হতেও পারে। কারণ আমি ব্লাইণ্ড হোস্টেলে দেখেছি বহু ব্লাইণ্ডই সমকামী। কখনো কখনো তাদের ধরে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার মধ্যে তেমন কোনো টান আমি খুঁজে পাইনি। হয়তো আমার সমস্ত অর্থে যৌন ধারণাই খণ্ড বা অস্বচ্ছ।

* তাহলে তো, একজন দৃষ্টিহীনের পক্ষে টিন্ এজের যে যৌনশিক্ষা তা হয়ই না।

—হ্যাঁ, আমি পর্নোও পড়ি নি। যে অভিজ্ঞতা প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়েরই থাকে। তবে পড়ে দেখলে হয় একদিন।

* তুই তো নিজে শুধু ব্রেলই পড়তে জানিস। আমাদের লিপি কি পড়তে জানিস? অথবা আমাদের লিপির ছবি সম্বন্ধে ধারণা আছে তোর?

—একদমই না।

* তোর কি মনে হয় না, তোর চারপাশের যে প্রচলিত ভাষা, তা সম্পূর্ণ অর্থে তোর ভাষা নয়। চোখের দেখা থেকে আমরা শব্দ তৈরী করেছি। আমাদের শব্দের যে বিশেষণ, তা দৃশ্য থেকে দেখে নেওয়া। বিশেষণময় শব্দই বেশি। বস্তুর যে গুণবিশিষ্ট নাম আমরা ঠিক করি, বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী—তা মূলত দেখা থেকেই ঠিক করি। আর তুই এই দেখা জগৎটাকেই জানিস না। অথচ তোর নিজস্ব কল্পনার যে অদেখা জগৎ, যা স্বজ্ঞানের জগৎ, বোধ বুদ্ধির জগৎ, তার কোনো ভাষা নেই। তোকে সেই আমাদের জগতের ভাষায়, শব্দে ভাব প্রকাশ করতে হয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ঠিক কথা। আমার মনে হয় শুধু সংখ্যাগুরুর স্বার্থে কম্প্রোমাইজ করছি। আর এখন তো অভ্যেস। অভ্যেস থেকে মানিয়ে নিয়েছি। যেমন, সিনেমা দেখছি। আমরা বলি সিনেমা শুনছি। আমাদের দৃষ্টিহীনদের যে লিমিটেশন, সেটার একটা ভাষা হওয়া উচিত ছিল। আমি বার বার বলছি কাল্পনিক জগৎটা অনির্বচনীয়। এই 'অনির্বচনীয়'টা বলছি শব্দ সংকটের জন্যে। আমাদের জগতের ভাষা নেই। আমাদের জগৎ

তোমরা জানতে পারছো না। যদি লিখে রাখা যেত তবে জানতে পারতে। ব্রেলের ভাষাও তাই দৃশ্যমানদের জগতের ভাষা। এখানে সংকেতটা শুধু তোমাদের থেকে পৃথক। ছবিটা আমাদের সুবিধা মত, উঁচু নীচু করে লেখা।

* ছবি সম্বন্ধে তোর কি ধারণা আছে? চিত্রশিল্প আরকি—

—কোনো ধারণা নেই। রবীন্দ্রনাথ বড় লেখকের বাইরে, কতবড় চিত্রকর তা আমি জানি না। দুর, ছবি!! আমাকে কেউ ছবি আঁকতে দিলে আমি শুধু কালি জেব্‌রে দেব। কারণ আমি দেখেছি একটা সাদা কাগজে কিছু রঙ জেবরানো। আমি যতটুকু রঙ দেখতে পাই সেই অনুযায়ী।

* অমরনাথ, তোর অনেকটাই কল্পনার জগৎ। আবার আমরা যারা দেখতে পাই তাদেরও একটা কল্পনার জগৎ আছে। ছোটবেলায় ছিল পক্ষীরাজ ঘোড়া, দত্যি-দানো।

—খুব ছোট কালে এই ধারণাগুলো ব্ল্যাঙ্ক ছিল। যবে থেকে ঘোড়া এবং পাখি স্পর্শ করলাম, সেদিন বুঝলাম পক্ষীরাজ ঘোড়া। অর্থাৎ উভয়েরই অভিজ্ঞতা থেকে কল্পনায়। অভিজ্ঞতার হাত ধরে কল্পনার জগতে প্রবেশ।

* আর এটাই ধর কালের দিক থেকে? কাল তখন কল্পনার মাপকাঠি হয় তখন?

—নেই। ধরো, বৈষ্ণব পদাবলীর জগৎ। ঘাট নদীর। রাধা স্নান করছে। আজও কোনো মেয়ে স্নান করছে। এই দুটো দৃশ্যের মধ্যে আমার কোনো কালগত পার্থক্য বোধ নেই।

* তুই কখনো কবিতা লিখেছিস?

—লিখেছি। ব্রেলে লিখেছি। বিষয় ছিল একটা সত্যি ঘটনা। একবার একটা দৃষ্টিহীনদের গ্রুপ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিল। তাদের সিকিউরিটিরা ঢুকতে দেয়নি। উল্টে পুলিশ দিয়ে মারে। এবং ভ্যানে করে তুলে নিয়ে যায়। বহুদূর গিয়ে যখন দৃষ্টিহীনরা সামান্য জল খেতে চায়, তখন তাদের একটা নির্জন জনহীন জায়গায় ছেড়ে দিয়ে গাড়িটা চলে যায়। এটাই ছিল কবিতার বিষয়। তার বাইরে তোমাদের যে দৃশ্যবর্ণনার বিষয়, তা আমার কবিতায় থাকে না। আমার কবিতায় শুধু আওয়াজের বর্ণনা, শব্দের কবিতা। পাঁজা তুলোর মত মেঘ হবেনা। হবে শব্দময় মেঘ, গুরু গুরু মেঘ কিম্বা বৃষ্টি। সঙ্গে গন্ধের কথা থাকবে।

* অমরনাথ, তোর দাড়ি কাটে কে?

—দাড়ি নিজে কামাই। কেউ থাকে না। শুনে আশ্চর্য হবে, কোনো দিনও কাটেনি গাল। কাপড় নিজে কাচি। কাজ করতে ভালই লাগে। কেউ কাজ দিলেও খুব ভাল লাগে। হোস্টেলের থেকে একা একাই রাস্তা পার হয়ে কলেজে আসি। এঘর, ওঘর করি, লাইব্রেরী যাই। ক্লু দেখে হাঁটি। অসুবিধা হয় না। আলো-ছায়ার মাধ্যমে। রাতে অসুবিধা হয় কখনো। রাস্তা বেঁকে যায়। পড়াশোনার ব্যাপারে একজন রিডার আছেন। ক্লাসের ছেলে মেয়েরা সাহায্য করে। এই দেখো না, ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েরাও সাহায্য করছে আমাকে। সঙ্ঘমিত্রা, সাগরী, অপর্ণা, শুভ্রা, মৌ এরা সবাই। পড়ে শোনায় আমাকে। সাগরী, শুভ্রারা তো কাল ব্রেলও শিখছিল আমার কাছে। সাগরীটা খুব ছেলে মানুষ। হৈ হৈ করে বেশ বাচ্চাদের মত।

* হ্যাঁ, ওকে খুব মানিয়েও যায়। ওর মুখটা দেখতেও খুব ইনোসেণ্ট।

—মোটেই না। বরং অপর্ণা বেশি ইনোসেণ্ট। ও একদিন কথা প্রসঙ্গে 'না' বলেছিল এমনভাবে, সেটা প্রেমিকার মত। ইনোসেণ্ট না হলে এভাবে বলতে পারে না। যদিও ও সুমনের প্রপার্টি।

* মেয়েদের প্রপার্টি মনে করিস নাকি?

—একদম না। ইয়ার্কি করে বললাম। বরং আমি বলি, যদি ও আমার প্রপার্টি হয়, তাহলে আমিও ওর প্রপার্টি।

[বিকেল চারটে কুড়ি বেজে গেল।

কথামত সেই মেয়েটি চলে এল অমরনাথের কাছে। যাকে অমরনাথ পছন্দ করছে। খুব টেন্‌শন্ ধরা পড়ল অমরনাথের মুখে। কিভাবে বলবে পছন্দের কথাটা, তা নিয়েই যথেষ্ট চিন্তায় ও। আর সবাই যেভাবে বলে, সংকোচ নিয়ে অস্পষ্ট ভাবেই হয়তো অমরনাথও বলে ফেলবে কথাটা। উঠে আসার পরে জানি না কি হয়েছিল সেদিন। তখন শেষ রোদ মাথা ঝুঁকিয়েছে। বিকেলের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ আর হাওয়া। বসে রইল অমরনাথ আর সেই মেয়েটা, অমরনাথ যাকে প্রপার্টি ভাবে, সে কি ভাববে অমরনাথকে প্রপার্টি?]

উলট্‌পুরান

অপূর্ব সাহা

যে কোন শিল্পের মতো একদিন ব্যর্থ হবে আমাদের প্রেম
নেশার ভয়াল স্রোত টেনে নেবে অভ্যাস শিবিরে
যে পণ্ডিত গান গাইবে আর যে মানুষ স্বপ্নদোষে
জেগে উঠবে একা আমি তার পড়শীর মতো
আকাট মূর্খের মতো হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠবো ভাওয়াইয়ার সুরে
শূন্য নিয়ে কথা ব'লবো নিখুঁত পর্যায়ে
শূন্য থেকে টেনে আনবো অলৌকিক বাজারের ব্যাগ
ধূপকাঠি চিতাকাঠ পঞ্চভূত ম্যাজিক ম্যাজিক মহাশয়

বৈশাখের স্থূল রোদে মেয়েটিকে করুণা করেছি
আর তার প্রেমিককে চূড়ান্ত বিদ্রূপ—
মৃতের আত্মা এসে নীলামে কিনুক তার নিজস্ব শরীর
প্রোষিতভর্তৃকা তার স্বামীকে ফেরাক বারবার
পেয়ারারা গাছেই বাড়ুক
বিবৃতি পড়ুক সব কবি আর স্বেচ্ছাসেবী বেশ্যার দালাল
শোকপাথরের টানে উঠে এসো অজ্ঞানতা উঠে এসো
নাভিমূলে অঙ্কুরিত জ্ঞানের দোপাটি
কাবাডি খেলবো এসো জ্যোৎস্নাভেজা মাঠে
তাড়িত হবার মতো স্মৃতি নেই মজাবে যে কুল
যে কুল থমকে গিয়ে দেখে নিচ্ছে একাকীত্বে অসহায়
নীতিবাদী রমণীর ঈর্ষনীয় ঠ্যাং
দোল খাচ্ছে পেন্ডুলাম যেন নাক্ষত্রিক যৌন অনুভূতি
পুরোনো প্রথার মতো শিল্পের স্বরূপে এসে মানুষেরা
সাঁতার শিখেছে আর মিথ্যা শব্দ ভাষা ও নগরে

যে কোন শিল্পের মতো ব্যর্থ হবে আমাদের প্রেম
যে কোন প্রেমের মতো এই নির্যাতন।

যে আসে

ইন্দ্রনীল রায়

যে আসে যে যায়
যে শুধু বসে থাকে নির্জনে বৃহতের কাছে, একা
সে নয়
যে যায় সেই যায়
অরণ্য পাহাড় অথবা সমুদ্রের গাঢ় ডাকে নয়
অলৌকিক আলোয় প্রান্তর আকাশ দেখবে বলে নয়
অনিবার্য বাস্তবতা নাগরিক কোলাহল ছেড়ে নয়
সে যায় লৌকিক বিলাস ছেড়ে বহুদূরে অন্যপথে
নিজস্ব নির্মাণ ফেলে অসংলগ্ন পদক্ষেপে যায়
শিকড়ের নীচে জমা অমোঘ পিছুটান সযত্নে গভীরে তুলে রেখে
নিজস্ব আবাস ছেড়ে যায়
সেই যায়
যায় অথবা ফিরে আসে সেখানে যাওয়ার কথা তার—

ক্রিমিয়া যুদ্ধের সৈনিকের প্রতি

রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

অন্ধকারকে বেছে নেওয়া মানুষ তুমি কি
জাননা জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো তোমার
কলম দিয়ে লেখা ?
একটি নারীর হৃদয়
আবার ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ?
কালো পোশাক পরা সৈনিকের দল ?
অ্যালবামে বাঁধানো ছবি ; ক্লান্ত মুখ
কাপড় বেঁধে স্টেজ করে থিয়েটার
আজকের খবর : সতের দিন একটানা
যুদ্ধ চলছে, চলবে
রঙিন পোশাক পরা অভিনেতা ভুলে
গেছিল অভিনয়ের কথা
একটি নারীর হৃদয়
যুদ্ধে যাবার ঘণ্টা বাজে ।

প্রাসঙ্গিকী

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঋতুর সময় বদলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। গনতন্ত্র, মুক্তি, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, এসব দিয়েই গড়ে উঠছে অন্য একটা পৃথিবী। আমরাও চিনছি পরিবর্তনের হাওয়ায় নতুন সময়কে। কলেজ বদলাচ্ছে মেধার থেকে বুদ্ধির দিকে। ইচ্ছা ছিল, সে বিষয়ে একটা সমীক্ষা করব। স্থানাভাবে হল না তা। যা হল, যা গতানু গতিক। এখানে ফুটে না উঠলেও কলেজ বদলাচ্ছেই।

অর্থনীতি : উজ্জ্বল একঝাঁক ছাত্রছাত্রী আর অধ্যাপকদের নিয়ে বিভাগ চলেছে। গবেষণার কাজ এবং সেমিনার নিয়মিতই। বক্তৃতা দিতে আসেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক মিহির রক্ষিত "স্টাডিজ ইন দি ম্যাক্রো-ইকনমিক্স অফ ডেভলপিং কান্ট্রিজ" নামে মূল্যবান একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। বিভাগের ফলাফল খুব ভাল।

ইংরেজি : বিভাগের ফলাফল ভাল। সেমিনার লাইব্রেরী চলেছে। অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা' ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এবং অধ্যাপক অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় টেগোর রিসার্চ সেন্টারের "রবীন্দ্রভাবনা" পত্রিকার সম্পাদক হয়েছেন।

ইতিহাস : বিভাগে অধ্যাপক বদলী হয়েছেন। উল্লেখ যোগ্য তিনটি সেমিনারে এসেছিলেন ডঃ ডেভিড ওয়াশব্রুক, অক্সফোর্ডের ডঃ তপন রায়চৌধুরী এবং দিল্লীর শ্রীসুমিত সরকার। বিভাগের ফল ভাল।

উদ্ভিদবিদ্যা : ছাত্রছাত্রীদের মতে বিভাগের কিছু সমস্যা আছে। ফলাফল বেশ ভাল। গবেষণা চলেছে দারুণ ভাবে। উত্তর-পশ্চিম ভারত এসকারশনে যাওয়া হয়েছে।

গণিত : স্থানাভাব এবং অপরিষ্কার ঘর নিয়েও ফলাফল ভালই। অধ্যাপকরা সেমিনার, ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করছেন।

দর্শন : ফলাফল খুব ভাল। অধ্যাপক পদ একটি খালি আছে। ডঃ চার্লস সোরাবজি এসে সেমিনার করে যান। ছাত্র ছাত্রীরা বেড়াতে, পিকনিকে যাচ্ছে ছুটিতে।

পদার্থবিদ্যা : এম এস. সি-তে বিশেষপত্র ইলেকট্রনিক্স পড়ানো শুরু হয়েছে। কম্পিউটার ঘরটি বাতানুকূল হয়। কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য সেমিনার সহ বিভাগের ফলাফল এবারও খুব ভাল।

প্রাণিবিদ্যা : দেওয়াল পত্রিকা 'স্পন্দন' বের হচ্ছে। সেমিনার অব্যাহত। ফলাফল যথেষ্ট উল্লেখ যোগ্য।

বাংলা : অধ্যাপক বদলী ঘটেছে। সেমিনার লাইব্রেরী নতুন প্রাণ পেয়েছে। পিকনিক্ হচ্ছে। অধ্যাপক স্বরাজব্রত সেনশর্মা সেমিনার এবং চিত্র প্রদর্শনী করেছেন। অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় 'দেশ' র গল্প ও গ্রন্থ সমালোচনা নিয়মিতই করে চলেছেন। ফল মোটামুটি।

ভূগোল : কলেজ মাঠ জুড়ে প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে নিয়মিত। ফলাফল ভালই। দক্ষিণ ভারত এবং দীঘা এসকারশনে গিয়েছিল ছাত্রছাত্রীরা।

ভূতত্ত্ব : ফলাফল বরাবরের মত এবারও ভাল। গবেষণা তীব্র ভাবেই চলেছে। গবেষণা পত্রিকা The Indion of Carth Seicnco প্রকাশের ১৬ বছর পূর্ণ করেছে।

রসায়ন : এখনো 'কিমিয়া' বের হচ্ছে। গবেষণা এবং পরীক্ষার ফলাফল বেশ ভাল। জনপ্রিয় লেখক, অধ্যাপক পার্থ সারথি চক্রবর্তী নিয়মিত লেখালিখি করছেন।

রাশিবিজ্ঞান : অধ্যাপক অতীন্দ্র মোহন গুণ এবং বিশ্বনাথ দাস সেমিনার করতে গৌহাটি এবং দিল্লীতে গিয়েছিলেন। ফলাফল ভাল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ফলাফল সন্তোষজনক। দুটি উল্লেখযোগ্য সেমিনার হয়েছে। অধ্যাপক অমল মুখোপাধ্যায়ের 'Socialist Perspective' পত্রিকার ১৭ বছর চলেছে।

শরীরবিদ্যা : "প্রাচীরিকা" বের হচ্ছে। ফলাফল ভাল। অর্থের অভাবে এসকারশনে যাওয়া যায় নি।

সমাজতত্ত্ব : নতুন বিভাগ, ২০ জন ছাত্রছাত্রী। সেমিনার লাইব্রেরী হয়েছে কিন্তু ক্লাসঘর ও সুষ্ঠ ব্যবস্থার অভাব আছে।

হিন্দী : ভর্তির আসন বেড়েছে। অধ্যাপক সুব্রত লাহিড়ী এবং রামরাজ সিংহ নিয়মিত সেমিনার ও লেখালিখি করছেন। ফল ভালই। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই বাঙালী।

গ্রন্থাগার : নতুন বই কেনা হয়েছে। বিগত দাবীগুলো সবই পড়ে আছে। অ্যাডমিট কার্ড দেবার পর থেকে পরীক্ষার আগে অবধি যাতে বই পাওয়া যায় সে দাবীটাও যুক্ত হয়েছে। কর্মচারীদের ব্যবহার আজও চমৎকার। প্রবোধ কৃষ্ণ বিশ্বাস পি. এইচ. ডি করেছেন।

ক্রীড়া বিভাগ : এবারও আশিস মণ্ডল চ্যাম্পিয়ন। মেয়েদের মধ্যে পারমিতা ঘোষ। মাঠের অবস্থা খারাপ। প্রয়োজন দু'টি মালীর। অন্যান্য খেলাধূলা চমৎকার এগোচ্ছে।

ইডেন হিন্দু হোস্টেল : সুপার পরিবর্তন হয়েছে। কিছু অন্যায্য দাবীর বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন চালায়। দু'নম্বর ওয়ার্ডে এখনো স্নানঘর নেই।

চলচ্চিত্র সংসদ : প্রায় উঠে যাবার মুখে অমিতেন্দু হাল ধরে। অনিয়মিত কয়েকটি ছবি দেখানো হয়েছে। নতুন উৎসাহী ছেলেমেয়ের অভাবেই ফাইল পত্র বন্ধ।

ড্রামা সোসাইটি : ড্রামা সোসাইটি নাট্যোৎসব করল। করল শ্রুতিনাটক। পুরস্কার ও প্রশংসার শুদ্ধ, আশিস সুনীত, লায়লা, ব্রাত্যরা চমকে দিয়েছিল। এখন আবার শুনশান।

ক্যান্টিন : পোষ্টার পড়ছে, তবে আগের তুলনায় কম। দরজায় পাশে ওয়াটার কুলার এখনো জড়ভরত হয়ে দাঁড়িয়ে। নতুন ঘরটায় আজকাল ভালোই আড্ডা জমছে। তবে খাবারের দিক থেকে প্রমোদদার ক্যান্টিন যে জাতে উঠেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মোসলাই আর চাউমিনের গন্ধে আজকাল দুপুরগুলো একটু অন্যরকম। রসনার তৃপ্তি কতটা হয়েছে বলা শক্ত তবে প্রমোদদার কাছে কারুর কারুর ধারের পরিমান যে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে এবং বাড়ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু রাজীব, সঞ্জয়, কৈলাস, প্রফুল্ল, টুকুনদের নিয়ে প্রমোদ-দা লড়ে যাচ্ছে। তার বিশ্বাস আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পয়সা আগের থেকে অনেক বেশি। হয়তো সত্যিই। তবে ক্যান্টিন চালানোর দায়িত্ব ক্রমশই গুরুভার হয়ে উঠছে। 'চীপ'ক্যান্টিনের দাবী কি কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হতে পারে না ?

পরিচিতি

সুনীল রায়চৌধুরী ঃ অধ্যক্ষ, প্রাক্তন ছাত্র।
স্বরাজব্রত সেনশর্মা ঃ অধ্যাপক, বাংলা। সেনগুপ্ত পদবীতে লেখেন 'পুরগামী' পত্রিকার সম্পাদক।
কাজল সেনগুপ্ত ঃ অধ্যাপিকা, ইংরেজি।
দেবাশিস সেন ঃ শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক, প্রাক্তন ছাত্র।
অতীন্দ্র মোহন গুণ ঃ অধ্যাপক, রাশিবিজ্ঞান।
প্রশান্ত রায় ঃ অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব।

প্রথম বর্ষ

ইন্দ্রনীল রায় ঃ মাঝে মাঝেই কঠিন বিদেশী বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়েছে কিনা খোঁজ নেন। বন্ধুদের সমস্যা সমাধানে দার্শনিক আনন্দ পান। যদিও নিজস্ব সমস্যায় ক্রমশ কৃশকায়। পদার্থবিদ্যা।

রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সোজা ভাবে হাঁটেন, ধীরে কথা বলেন। বান্ধবীদের নামে কবিতা লিখে ছাপাতে ভালবাসেন। অ্যাডমিশন টেস্টে কারো খোঁজে বন্ধুকে হাতে পোস্টার নিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। ওর মতে, 'সাউথ ইণ্ডিয়ানরা রিয়েলি এ্যাট্রাক্টিভ'। রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

শমিত রায় ঃ যৌথ পরিবারের স্মৃতি, ট্যাঁশ বাঙালীত্ব, লোকসঙ্গীত ও শিল্পে গভীর আস্থা তাকে ভালবাসা বিষয়ে আশাবাদী করে তুলেছে। বেতালে চলা বদলে এখন তাই 'নৈনি'তালে। ক্যাজুয়াল কবি ও কাঙাল। ওর বিশ্বাস, সব দোষ বাবার ; ওর দোষ, ও শুধু টিন্‌এজার। বাংলা।

বৈজয়ন্ত চক্রবর্তী ঃ নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে ঘোরা ফেরা করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবির মত এদিক ওদিক তাকান। বন্ধুরা বলে, ওর হাসি জ্যোতি বাবুর মতন।

দ্বিতীয় বর্ষ

অর্পণ চক্রবর্তী ঃ 'উপদ্রুত অন্ধকারে'র কবি। 'পরীক্ষিত' সত্য যে, এর উপরে ক্লাশের ছেলেমেয়েরা ক্ষেপে আছেন। কোন এক ক্ষ্যাপাবাবা কপাল দেখে বলেছেন, ওর নোবেল প্রাইজ যোগ আছে। বাংলা। মনে হয় না।

রত্না দত্ত ঃ মাঝে মাঝেই জমজমাট ক্যান্টিনে চোখে পড়ে এর একাকী গাণিতিক পদধ্বনি। সম্ভবত কোনো বিশেষ সমাধানের সন্ধানে রয়েছেন। গণিত।

শিলাদিত্য চক্রবর্ত্তী ঃ এই আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে মহিলা ও সংস্কৃতি আদৌ সম্ভব কিনা ভাবতে হবে। পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের প্রচুর সময়—যেমন ঘুমোবার, তেমনি লেখালিখি করবার। বিষয়টা সংগ্রাম। প্রেম কি অত সহজ?—কমিটেড্ হতে হয়! বাংলা। কমিটেড্ নয়॥

তৃতীয় বর্ষ

অনুরাধা ঘোষ ঃ মানুষ একটু হেঁটে চলে বেড়াবে—প্রেসিডেন্সি কলেজের শিল্প আন্দোলন ও নিবেদিতা। মানুষ একটু ফুরফুরে হবে—গরমকাল কবে আসবে অনুরাধা? ইংরেজি।

অভীক বর্মন ঃ ননসেন্স, কুইজ, দর্শন এবং সংস্কৃতি চর্চার বাইবে অপরিচিতার সঙ্গে আলাপে অভীক সব সময় নির্ভীক। এক সময় শরীর বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁকা সত্ত্বেও শোনা যায় বিদেশেই রয়েছে তার যা কিছু নান্দনিক, এবং সেই গন্তব্যেই তিনি আগুয়ান। এ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। অর্থনীতি।

অননীশ চৌধুরী ঃ বন্ধু মহলে 'Hi'-দা নামে পরিচিত। অহেতুক আর্কিক হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য যা যা বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয় সবই এর রয়েছে অনেকটা অপ্রয়োজনীয় ভাবেই। অর্থনীতি।

অচ্যুত মণ্ডল ঃ আচার-আচরণে পৃথিবীর যাবতীয় গণআন্দোলনের সাক্ষী। যদিও বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবি হওয়াটাই জীবনের লক্ষ্য, তাই, নিরোদ সি চৌধুরীর একমাত্র বাঙালী ভক্তটি সে শূন্যস্থানের আশায়। বাংলা।

চিরঞ্জীব সরকার ঃ হেরমান হেসে ও চিরঞ্জীব সরকার নারী ও শব্দ বিষয়ে সমান উদাসীন। তাঁর প্রেমের চিঠিগুলি কাকে লেখা—লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন তা জানাতে পারে নি। তবে জানা গেছে মহাযানপন্থী চিরঞ্জীব বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গের সঙ্গে সম্প্রতি নবমটি সফল ভাবে জুড়ে দিয়েছেন। নবমটি 'সদ্‌নিদ্রা'। বাংলা।

সৌম্য দাশগুপ্ত ঃ কোনো অজ্ঞাত কারণে হেয়ার স্কুলের গেট দিয়ে কলেজ ঢুকতেন। শপথ নিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক কবি হয়েছেন, তবুও স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অটুট আছে। সম্প্রতি বিদেশে। রাশিবিজ্ঞান।

তন্ময় মৃধা ঃ নিজেকে শিল্পী ভাবার প্রতিভায় বিশ্বাস রাখেন। বিক্রির আশায় জুনিয়র এক ছাত্রীর ছবি এঁকেছিলেন কিন্তু সফল্ হন নি। তারপর ৯৯%বিক্রির আশা নিয়ে এক অধ্যাপকের বিকৃত ছবি আঁকলেন (উদ্দেশ্য, সে ছবি বাজারে থাকলে অধ্যাপকের লজ্জা) কিন্তু, সে উদ্দেশ্যও বিফল হয়েছে। শোনা যায়, কোনো এক সহপাঠিনীকে পছন্দ করে S. C. কোটায় অ্যাপলিকেশন করেছিলেন। বিফল হয়েছেন। বাংলা। সফল হয়েছেন।

বিবেক সেন ঃ শৈশব থেকেই এ যুবক বুদ্ধিজীবি। উঠন্তি মূলো পতনে চেনা যায়। তবে নিন্দুকের তো অভাব নেই, বিবেককে তারা কডওয়েলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে চায়। গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ অবশ্য নেই। দু'জনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য তো আছেই। কডওয়েলের বেশীটা ইলিউশন্ বাকিটা রিয়ালিটি। বিবেকের সবটাই 'রিয়া'-লিটি। অর্থনীতি।

শিবানী সেনগুপ্ত ঃ নিরিবিলি ভালবাসেন তাই বেশী জানা যায় না এর সম্বন্ধে। ইংরেজী কবিতা লিখলেও, আরশোলা ভয় পান (গোপন সূত্র)।

শান্তনু মিত্র ঃ কথোপকথন বা আচার ব্যবহার, সবটাতেই একটা ব্যাপার স্পষ্ট ভারসাম্যহীনতাব প্রতি এর রয়েছে নিদারুণ আকর্ষণ। পাল-তোলা নৌকায় একদা গা ভাসিয়েছিলেন। আপাতত গণিতেই খুঁজছেন দ্রষ্টব্য যা কিছু। পিলে চমকানো রঙের পোষাক পরিধানের জন্য জমজমাট ক্যান্টিনেও অলাদাভাবে চোখে পড়েন। অর্থনীতি।

নৈরঞ্জনা দাশগুপ্ত ঃ রাশিবিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির আকর্ষণে পুষ্করিণী হয়ে উঠেছেন। শোনা কথা, জুনিয়ার ছাত্রদেব প্রতিও এর রয়েছে প্রায় অবৈজ্ঞানিক আকর্ষণ। রাশিবিজ্ঞান।

রঞ্জনেন্দ্র নারায়ণ নাগ ঃ নামের মতই এর চালচলন, আর পদবীর মত· । অর্থনীতিতে প্রবল সাফল্য সত্ত্বেও গণিতের প্রতি রয়েছে 'সোমা'ন আগ্রহ। চলতি বামপন্থী রাজনীতি নিয়ে ইউনিয়ন মিটিং-এ হাত-পা ছুঁড়ে দ্রুত কথা বলেন। অর্থনীতি।

গোরা গাঙ্গুলী : আর্থিক সাম্য-ভারসাম্যের তত্ত্বের মধ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে রাখতে হঠাৎই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের টানে স্থিতিহীন হয়ে পড়েন। বর্তমানে সাম্য ফিরে পেয়ে নতুনভাবে স্থিতিহীন হওয়ার জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছেন। অর্থনীতি।

বিনাদিত্য সরকার : প্রথম দর্শনেই মনে হয় প্রৌঢ়, যদিও তা অবশ্যই বিতর্কিত। মেকিয়াভেলি ও মার্ক্সকে প্রতিবেশী মনে করেন। প্রবন্ধ প্রিয় এই ব্যক্তির চুলের গড় উচ্চতা এক সেন্টিমিটার। সাদা ফুল শার্ট ও চশমা আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

পরীক্ষিৎ ঘোষ : আড্ডা, পরীক্ষা, ক্যুইজ, হস্তচর্চা সবেতেই এর আন্তরিকতা সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষিত। হয়তো এর প্রধান কারণ এই, ব্যক্তিগতভাবে তিনি এখনো সে রকম ভাবে পরীক্ষিত হননি। অর্থনীতি।

দেবাশিস দাস : শীতকালে জ্যাকেট পড়তে ভালবাসেন। গরমে পাঞ্জাবী। দৈব প্রভাবে কিনা বলা শক্ত, তবে 'নীলাভ অঞ্জনের' দ্যুতি পাশ কাটিয়ে জীবনে নতুন 'পরমার্থ' খুঁজে নেওয়া নিঃসন্দেহে কলেজে নজীর বিহীন কাজ। গত নিবাস রাজধানী। অর্থনীতি। এ সংখ্যার প্রকাশন সচিব।

ব্রাত্যব্রত বসু : ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত। রুদ্ধদ্বার সঙ্গীতও বলা যায়। গায়িকার নাম উহ্য থাকাই ভালো, কেননা বদলের রেওয়াজ রয়েছে। সব অর্থেই প্রখ্যাত পত্রকার। প্রাপক এবং পাঠকেরা অবশ্য এ ব্যাপারে সকলেই একমত নন। 'অম্নতং বাক্‌ভাষিতম্' ; অর্থাৎ ভালো ভালো কথা বলেন বাংলায়।

অর্ণব রায় : 'ব্যাতন না Zান্‌লি বন্দ্র-অবন্দ্র বুঝ্‌বো ক্যামেনে!' ভদ্রলোক। অন্ততঃ পক্ষে হওয়ার ব্যাপারে প্রয়াসী। প্রিয়জনের প্রয়োজনে লেখেন, আঁকেন, পরীক্ষা দেন। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের এই ভদ্রব্যক্তির সাফল্য কামনা করি।

স্নাতকোত্তর বিভাগ

অদ্রীশ বিশ্বাস : 'বিদিশা'র সম্পাদক আপতত নির্দিষ্ট দিশা নিয়ে 'মৌ' বনে। অন্বেষণ যে জমে উঠেছে তা বলা বাহুল্য। সাম্প্রতিক কাব্যচর্চায় সবকিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে সেই অন্বেষিত অনুরাগ। এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শঙ্খ ঘোষ আর ফেলুদার ভক্ত। বাংলা।

অমিতেন্দু পালিত : অমিতেন্দু, নাকি মানুষের ইচ্ছা পুরোনের গল্প। বড়দের কথায় কান দেয় না, ছিঃ!! ও রকম একটা ঠাণ্ডা পানীয়ের নিশ্চিন্ত রোমান্টিক জীবন র‍্যাবোঁও চেয়েছিলেন—আহা বেচারা!!! শুভাকাঙ্খীরা বলছে, ওর পকেটমার হোক!!!! নীতি-অর্থ!!!!!

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য : অম্বলে কষ্ট পান কিম্বা হঠাৎ স্বপ্ন দর্শনে কবিতা লেখার আদেশ পান। তারপরই কারো কারো ভক্ত হয়ে উঠেছেন। অবৈধ বন্ধুত্বের তালিকা বৈদেশিক ঋণের মত ক্রমবৃদ্ধি কালে প্রাক্তন রাজনৈতিক সহযোগী আটকে দিয়েছেন। পুরুষদের মত হাসেন। বাংলা।

তথাগত চট্টোপাধ্যায় : 'হিরো' বলতে যা বোঝায় ইনি অনেকটাই তাই। তবে ট্র্যাজিক না কমিক সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া মুশকিল। 'এত কাছে তবু এত দূরে'—বাক্যটি তার ক্ষেত্রে বারবার ফিরে আসে, তবে উল্টোভাবে কথনই নয়। ক্যুইজ এবং ম্যাজিক অনুরাগী। অর্থনীতি। দিল্লীতে।

দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুন্দর হাতের লেখায় একটা বাংলা উত্তর পত্র। দু'দিকে ও উপর নীচে মার্জিন। ভিতরে লেখা আছে ভারতীয় ভক্তিবাদের উত্তরাধিকার। এক কোনে মন্তব্য লেখা— তোমার উপমা তুমি। বাংলা।

সুপ্রিয় ঘোষাল ঃ গড়ন মাত্রাবৃত্তের, নিরাসক্ত – দলবৃত্তে, বিরক্ত মহিলাদের খেতে দেখে, আসক্ত দাবায়। পার্টনারকে বসিয়ে রেখে বোটানি পরীক্ষা দিতে হয় বলে শ্যামসঙ্গীতে আত্মমুক্তি খোঁজেন।

প্রাক্তন ছাত্র

বিপ্লব মুখোপাধ্যায় ঃ একা বিপ্লব রক্ষা করে হাংরি বুঁদির গড়। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় এক তিন পাতার আন্তর্জাতিক মানুষ। বাম আন্দোলনের ব্যর্থতা ও বামা আন্দোলনের ব্যর্থতা তাকে ঠেলে দিয়েছে পত্রিকা সম্পাদনার দিকে। পুরোনদের কাছে যদি মুখোশ, নতুনদের কাছে তবে ও বিকল্প। দর্শন।

যশোধরা রায়চৌধুরী ঃ আচমকা কলেজে এসে নষ্টলজিক আলোচনা শুরু করেন। সঙ্গ দোষে ছবি আঁকতেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন। বেশি লম্বা লোকজনদের পাশে রাখাটা বোকামি মনে করেন। দর্শনের এই ছাত্রীটি ডব্লু, বি, সি. এস-এ ষ্ট্যাণ্ড করে উঁচু পদে চাকরীও করছেন।

অপূর্ব সাহা ঃ অ শোক নাগরিক এক মধ্যবিত্ত বেহুইন। অপূর্ব লেখেন, ভাবেন, বই কেনেন। আপতত বেদাভ্যাসে (B,ED) নিযুক্ত। 'যে নদী মরু পথে হারালো ধারা' সাহারা ছাড়া আর কেউ 'এই প্রিয় বেদনা বোঝে নি।' বাংলা।

সুদীপ্ত সরস্বতী ঃ রাতের খাবার খেয়ে হোস্টেলের যে কোনো কারুর ঘরে ঘণ্টাখানেক ভারী বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বলে থাকেন এসব শ্রোতার হাজম রক্ষার তাগিদেই। এসব জানেন ভালই, বিষয় শরীরতত্ত্ব হেতু। (পুনর্মুদ্রিত, ১৯৮৬ সালের পত্রিকা থেকে)

Past Editors & Secretaries

Year	Editors	Secretaries
1914-15	Pramatha Nath Banerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangooli
1920-21	Phiroze E Dastoor	Shyama Prasad Mookherjee
1921-22	Shyama Prasad Mookerjee	Bimal Kumar Bhattacharya
	Brajakanta Guha	Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Uma Prasad Mookerjee	Akshay Kumar Sarkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K Mukherjee	
1926 27	Humayum Kabir	Lokesh Chandra Guha Roy
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Sunit Kumar India
1928-29	Sunit Kumar Indra	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Taraknath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Ajit Nath Roy
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Ardhendu Bakshi	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen	Abu Sayeed Chowdhury
	Nirmal Chandra Sen Gupta	
1939-40	A Q M Mahiuddin	Bimal Chandra Dutta
1940-41	Manilal Banerjee	Prabhat Prasun Modak
1941-42	Arun Banerjee	Golam Karim
1942-46		No Publication
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindra Mohan Chakravarti
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Manas Mukutmani
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Ashok Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957 58	Asoke Sanjay Guha	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakravarty	Rupendra Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherji	Alok Kumar Mukherjee
	Mihir Bhattacharya	
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee	Pritis Nandy
1964-65	Subhas Basu	Biswanath Maity
1965-66		No Publication
1966-67	Sanjay Kshetry	Gautam Bhadra
1967-68		No Publication

Year	Editors		Secretaries
1968-69	Abhijit Sen		Rebanta Ghosh
1969-72		No Publication	
1972-73	Anup Kumar Sinha		Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee		Swapan Chakravarty
1974-75	Swapan Chakravarty		Suranjan Das
1975-76	Shankar Nath Sen		
1976-77		No Publication	
1977-78	Sugata Bose Gautam Basu		Paramita Banerjee
1978-81		No Publication	
1981-82	Debasis Banerjee Somak Ray Chaudhury		Banya Datta
1982-83		No Publication	
1983-84	Sudipta Sen Bishnupriya Ghosh		Subrata Sen
1985-86	Brinda Bose Anjan Guhathakurta		Chandreyee Niyogi
1986-87	Subha Mukherjee Apurba Saha		Jayita Ghosh
1987-88		No Publication	
1988-89	Anindya Dutta Suddha Satwa Bandyopadhyay		Sanchita Bhowmick
1989-90	Abheek Barman Amitendu Palit Adrish Biswas		Debashish Das;

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
PRESENTED
CALCUTTA